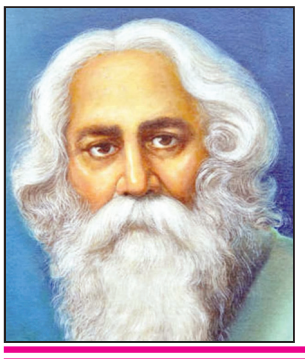

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ, মে-জুন ২০২২ ■ ৫০তম বর্ষ ■ মূল্য ২ টাকা

২২ জুন ২০২২

সুকোমল সেনের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন উপলক্ষে সাধারণ সভা

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কমরেড সুকোমল সেন রাজ্য সরকারী কর্মচারী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। চাকরিতে যোগদানের প্রথম দিন থেকেই তিনি এই রাজ্যের কর্মচারী আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন এবং

এ. শ্রীকুমার

ধীরে ধীরে সংগ্রাম-আন্দোলনের নেতৃত্বে উন্নীত হন। ঐক্যবদ্ধ কর্মচারী আন্দোলনের যৌথ মঞ্চ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির গঠনপর্বের তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা নেতৃত্ব। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে সেচ ও জলপথ অধিকারে করণিক পদে যোগদান করে তিনি পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের

শশীকান্ত রায়

বিজয় শংকর সিংহ

সদস্য হন এবং পরবর্তী পর্বে ঐ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব প্রতিপালন করেন। ১৯৬৮-৮৫ তিনি ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। সর্বভারতীয় কর্মচারী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। ১৯৬০ সালে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের গঠনপর্বে তিনি ছিলেন অন্যতম

সুবিমল সেন

সংগঠক। ১৯৮২ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সংগঠনের পঞ্চম সম্মেলনে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০০৮ সাল পর্যন্ত ঐ দায়িত্ব প্রতিপালন করেন। ২০০৮ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান। সর্বভারতীয় কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদানের পাশাপাশি তিনি আন্তর্জাতিক স্তরেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮২ সালে প্রাগে অনুষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল অব পাবলিক এন্ড এ্যালায়েড সার্ভিসেসের ডাইরেকটিভ কমিটির সদস্য হন। ১৯৯৬ সালে তিনি ঐ সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত হন এবং ২০০৯ সাল পর্যন্ত ঐ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের সময় কমরেড সুকোমল সেন সহ মোট ১১ জন নেতৃত্বকে সংবিধানের ৩১১(২)(গ) ধারায় বরখাস্ত করা হয়েছিল। ১৯৮২ সালে চাকরি থেকে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করে বামপন্থী শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্য সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত তিনি সাংসদের দায়িত্ব পালন করেন। মতাদর্শের ক্ষেত্রে কমরেড সুকোমল সেনের ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। তিনি ছিলেন সুবক্তা ও সুলেখক। দীর্ঘদিন সর্বভারতীয় সংগঠনের মুখপত্র

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

১২ই জুলাই কমিটির

নবম রাজ্য সাংগঠনিক কনভেনশন সাফল্যের সাথে সমাপ্ত

বিগত ১১-১২ জুন, ২০২২ কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ১২ই জুলাই কমিটির নবম রাজ্য সাংগঠনিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দু'দিন ব্যাপী এই কনভেনশনে

হান্নান মোল্লা

আড়াই শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম দিন রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদবেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে কনভেনশনের সূচনা হয়। সম্মেলন স্থলের নামকরণ হয় কমরেড শিবশঙ্কর রায় নগর এবং মঞ্চের নামকরণ হয় কমরেড দিলীপ রায় মঞ্চ। সম্মেলন উদ্বোধন করেন বামপন্থী কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব তথা সারা ভারত কৃষকসভার সাধারণ সম্পাদক হান্নান মোল্লা। তিনি বলেন, দেশের কৃষি ব্যবস্থাটাকে কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার নীল নকশা আঁকা হয়ে গেছিল। তখন বলা হচ্ছিল নরেন্দ্র মোদি পিছু হঠবে না। কিন্তু কৃষকরা প্রমাণ করেছেন যে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে পারলে ৫৬ ইঞ্চির ছাতিকেও ৬ ইঞ্চিতে পরিণত করা যায়।

হান্নান মোল্লা বলেন, রাজ্যের তৃণমূল সরকার আদ্যপান্ত অপরাধীদের সরকার। রাজ্যজুড়ে অরাজকতা ও লুটের রাজত্ব কায়েম করেছে তৃণমূল। এই পরিস্থিতির অবসানের জন্য তিনি কর্মচারী, শিক্ষক-শ্রমিকদের আরও বেশি করে প্রতিবাদে, প্রতিরোধে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান। **(উদ্বোধকের বক্তব্য এই সংখ্যায় পৃথকভাবে মুদ্রিত হয়েছে)**।

কনভেনশনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ নেতা প্রশান্ত মুখার্জী, পেনশনারদের যুক্ত মঞ্চের পক্ষে কাঞ্চন মুখার্জী, প্রতিরক্ষা কর্মচারী আন্দোলনের নেতা বীরেন সাহু, মার্কেন্টাইল কর্মী আন্দোলনের নেতা মতিলাল সিনহা, রেল কর্মচারী আন্দোলনের নেতা অজয় দত্ত, ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের

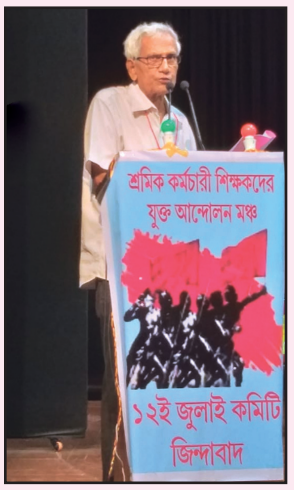

সমীর ভট্টাচার্য

নেতা জয়দেব দাশগুপ্ত প্রমুখ।

প্রতিবেদন উত্থাপন করেন অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সমীর ভট্টাচার্য এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন প্রদীপ গুপ্ত।

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে

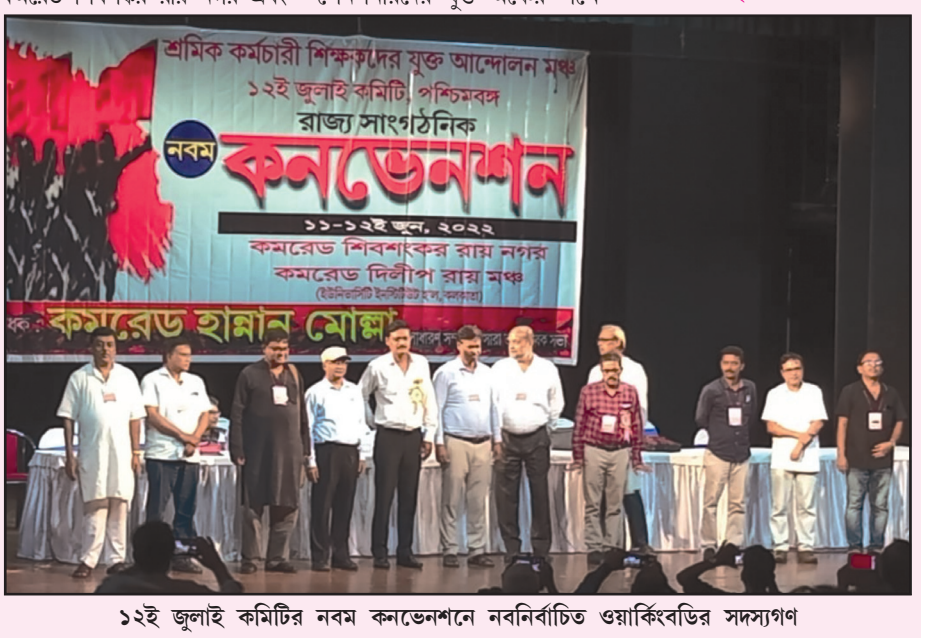

১২ই জুলাই কমিটির নবম কনভেনশনে নবনির্বাচিত ওয়ার্কিংবডির সদস্যগণ

সামাজিক দায়বদ্ধতা-জীবনের জন্য, জীবনের পরেও

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি-র উদ্যোগে

স্বেচ্ছা রক্তদান,
মরণোত্তর চক্ষুদান ও
দেহদানের অঙ্গীকার

উদ্বোধক :
মাননীয় দেবদূত ঘোষ বিশিষ্ট অভিনেতা

১৪ জুলাই '২২ ● কর্মচারী ভবন ● কলকাতা

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভেঙে দেওয়ার শাসকদলের হুমকির প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি শহরে ধিক্কার মিছিল

সম্পাদকীয়

মুখোশের আড়াল থেকে বেড়িয়ে আসা মুখ

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ, ১৯৫০ সালে সংবিধান কার্যকরী হওয়ার পরবর্তী ১৯৫২ সাল থেকে শুরু হয় সাধারণ নির্বাচন। সংবিধান নির্দেশিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী '৫২ সালে লোকসভা নির্বাচনের সাথেই অঙ্গপ্রদেশগুলির বিধানসভা নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে জনগণ তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ পান। এরপরে এই সুযোগ তাঁদের কাছে বারবার এসেছে এবং আসছে। একমাত্র ১৯৭৫ সালে ঘোষিত জরুরি অবস্থার পর্বটুকু বাদ দিলে, ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে কোনো সমস্যা হয়নি (বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন ছাপ্পা ভোট, ভোট লুট, বুথ জ্যাম ইত্যাদি 'অ্যাবারেশন' বা বিচ্যুতি বাদ দিয়ে)। নির্বাচকমণ্ডলীও তাঁদের অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে পছন্দের জানান দিয়েছেন বার বার। এমনকি এই পছন্দের ভিত্তিতে পরিবর্তনও ঘটেছে। রাজ্য স্তরে সেই সাতান্ন সাল থেকেই (কেরালা), আর কেন্দ্রে সাতাত্তর থেকেই। অবশ্য যে সংবিধান নির্বাচকমণ্ডলীকে তাঁদের পছন্দ বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছে, সেই সংবিধানেরই বিশেষ ধারা প্রয়োগ করে পছন্দকে উল্টেও দেওয়া হয়েছে একাধিকবার। আবার কখনও কখনও অর্থও ঘটিয়েছে এই অনর্থ। কিন্তু সব মিলিয়ে ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ ছিল জনগণ ও কিছু রাজনৈতিক দলের মধ্যে।

কিন্তু বিষয়টা ভিন্নমাত্রা পেল গত শতাব্দীর নব্বই দশকের একেবারে গোড়া থেকেই। ঠোক্কর খেয়ে, হোঁচট খেয়েও দাঁড়িয়ে থাকা ভারতীয় গণতন্ত্রের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল একটি ভিন্ন চরিত্র সম্পন্ন রাজনৈতিক দল। তার আগেও বহু দল তৈরি হয়ে টিকে গেছে বা কালের প্রকোপে হারিয়ে গেছে। ভিন্ন চরিত্রের দলটিও ভিন্ন নামে বহু দিন ধরে ভারতীয় রাজনীতির মঞ্চে জায়গা পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। কিন্তু দীর্ঘদিন জনগণ তাদের কক্ষে দেয়নি। জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ভিড়ে গিয়ে তারা তাদের অচ্ছুৎ অবস্থা থেকে বেড়িয়ে আসে এবং জরুরি অবস্থার অবসানের কিছুদিন পরেই নতুন নামে আবির্ভূত হয়। এরপরে প্রায় এক দশক নিজেদের প্রকৃত চরিত্রকে আড়াল করে আর পাঁচটা রাজনৈতিক দলের মতোই চেষ্টা করে গেছে নিজেদের জন্য জায়গা তৈরি করার। কিন্তু বিশেষ সুবিধা হয়নি। ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডজনিত পরিস্থিতি তাদের খোলস ছেড়ে বেরোতেও দেয়নি। তবে কয়েকটি রাজ্যে তাদের জমি একটু হলেও পোক্ত হচ্ছিল। যেমন উত্তরপ্রদেশ। দেশের নির্বাচনী মানচিত্রে সর্ববৃহৎ রাজ্য।

উত্তরপ্রদেশে তাদের সরকার। আবার উত্তরপ্রদেশেই রয়েছে অযোধ্যা। মহাকাব্যের নায়ক রামের জন্মস্থানও অযোধ্যা (যদিও ভৌগোলিক দিক থেকে এই দুই অযোধ্যা অভিন্ন কিনা তা নিয়ে ইতিহাসবিদ্‌রাও নিশ্চিত নন)। আবার ঐ অযোধ্যাতেই রয়েছে মোঘল সম্রাট বাবরের নামাঙ্কিত পাঁচশো বছরের পুরোনো মসজিদ। স্বভাবতই খোলস ছেড়ে বেড়িয়ে আসার জন্য মসজিদের তলায় খুঁজে বের করা হল রামচন্দ্রের আঁতুরঘর। তারপরের ইতিহাস সকলের জানা।

এই দলটির ভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চের কেন্দ্রে চলে যে ভবিষ্যতে বড় বিপদের কারণ হতে পারে, তা ঐ সময়েই সোচ্চারে বামপন্থীরাই একমাত্র বলেছিল। অন্য দলগুলি হয় এই বিপদ আঁচ করতে পারেনি, বা পারলেও অপর একটি জাতীয় দলবিরোধী অবস্থানকে পোক্ত করতে এদের সাহায্য লাগতে পারে—সম্ভবত এমন একটা রাজনৈতিক অঙ্ক থেকে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করেছিল। অথচ জননেতা কমরেড জ্যোতি বসু এদের সম্পর্কে বেছে বেছে যে দুটি বিশেষণ ব্যবহার করেছিলেন, তা থেকে এদের গোপন চরিত্র না বোঝার কোনো কারণ ছিল না। এমনকি বাবরি মসজিদকে উন্মত্তের মতো ধ্বংস করার পরও তা আরো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও নব্বই দশক জুড়ে দেখা গেল, বিভিন্ন রাজ্যে এরা সঙ্গী-সাথী জুটিয়ে নিতে পারছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যেও এদের পার্টনার খুঁজে পেতে অসুবিধা হল না।

কেন বামপন্থীদের অবস্থান ভিন্ন ছিল? একাধিক রাজ্যে অপর একটি জাতীয় দলের সাথে তো বামপন্থীদেরই মূল লড়াই ছিল। তা সত্ত্বেও দীর্ঘ বৈরীতা রয়েছে এমন একটি দলকে কোণঠাসা করার জন্য অপর একটি উদীয়মান 'খতরনাক' জাতীয় দলকে সমর্থন করার কথা বামপন্থীরা ভাবেই নি। কারণ বামপন্থীদের কাছে রাজনীতি কোনো পাশা খেলার কূট চাল নয়। রাজনীতি হল দেশ ও জনগণের স্বার্থ চর্চার ঘনীভূত রূপ। আর বামপন্থীরা এই চর্চাটা করে সুনির্দিষ্ট মতাদর্শের ভিত্তিতে। যে মতাদর্শ দেশ ও জনগণের প্রতি এক অপরিসীম দায়বদ্ধতার জন্ম দেয়। এই দায়বদ্ধতা থেকেই বামপন্থীরা বিপদঘণ্টা বাজাতে দেরি করে না। এক্ষেত্রেও করেনি। নব্বই দশক থেকে দ্রুতগতিতে শক্তি সঞ্চয় করা (কিছুটা নিজেদের কব্জির জোরে, কিছুটা অপরের ঘাড়ে প্যারাসাইটের মতো চেপে বসে) উদীয়মান জাতীয় দলটি যে 'কায়া' নয় 'ছায়া' মাত্র, সে কথা বামপন্থীরা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের আগে থেকেই বলতে শুরু করেছিল। ছায়াকে পরিচালনা করার রিমোর্ট কন্ট্রোল যে কায়ার হাতে, তার কীর্তির তালিকাও বামপন্থীরা জনসমাজ ও অন্যান্য দলের সামনে পেশ করতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেনি। সেই তালিকায় স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্রিটিশদের চরবৃত্তি থেকে শুরু করে, স্বাধীনতার পর মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার মতো বিষয়গুলি ছিল। আবার 'ছায়া' যেমন জনতা পার্টিতে মেশার আগে যে নামে পরিচিত ছিল (সুপরিচিত ছিল তা বলা যাবে না), জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে আসার পর জনগণ ও রাজনৈতিক চক্রকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ভিন্ন নাম নেয়। তেমনই গান্ধী হত্যার পর কায়া নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে, নিষেধাজ্ঞা তোলার জন্য ভোল পাল্টানোর প্রতিশ্রুতি (সাংস্কৃকি সংগঠন) দেয় সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের কাছে (তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী)। এই অবগুণ্ঠন ছিল নেহাতই জনরোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। হেডগেওয়ার, সাভারকার, গোলওয়ালকার বা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রদর্শিত পথ থেকে কখনও এরা সরে আসেনি। উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরেছিল মাত্র। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কিছুটা স্তিমিত রেখে লাঠি খেলা, ড্রিল, প্যারেড ইত্যাদির মাধ্যমের বোঝানোর চেষ্টা চলছিল যে, দেখো আমরা কেমন রাজনীতি থেকে শতযোজন দূরে। এদের নিজস্ব অসংখ্য শাখা সংগঠন সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় চালু রাখার পাশাপাশি, বিভিন্ন নামের সংগঠন তৈরি করে কাজ শুরু হল সমাজের বিভিন্ন বিভিন্ন অংশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে। লক্ষ্য মগজ ধোলাই। লক্ষ্য রাজনৈতিক প্রকল্প বাস্তবায়নের জমি প্রস্তুত করা।

তাই আশির দশকে পুনরাবির্ভাব বা নব্বই দশকে পুনরুত্থানের আগের সলতে পাকানোর পর্বটা অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তি বিচ্ছিন্ন বিষয় বলে মনে করলেও বা বিপদ আঁচ করেও, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে তা উপেক্ষা করলেও, বামপন্থীরা করেনি। গত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রায় প্রথম দশকজুড়ে সংসদীয় কাঠামোর অভ্যন্তরে বামপন্থীরা অতীতের তুলনায় বর্ধিত শক্তি নিয়ে উপস্থিত ছিল। এই বর্ধিত শক্তিকে ব্যবহার করে চেষ্টা করা হয়েছে উদীয়মান ভয়ঙ্কর শক্তির রাজনৈতিক মিতালির বৃত্তকে সঙ্কুচিত করার। এই উদ্যোগের ফলে ভাঙা-গড়া চলেছে।

এখন তোমার আড়ি, এখন তোমার সাথে ভাব—এইভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি কখনও হাত ধরেছে, কখনও ছেড়েছে (যেমন আমাদের রাজ্যে)। বলা বাহুল্য সবটাই হয়েছে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে, মুখোশের কার্যকলাপ বিবেচনা করে। কিন্তু মুখোশের পেছনে 'মুখটা', যাদের হাতে রয়েছে রিমোর্ট কন্ট্রোল, তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বামপন্থীরা বার বার সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেও, সংখ্যাতত্ত্ব ভিত্তিক সংসদীয় টানাপোড়েনে, সবক্ষেত্রে না হলেও, বহু ক্ষেত্রেই তা কাকস্য পরিবেদনায় পরিণত হয়েছে।

দেশ নয়, দেশের জনগণ নয়, সংবিধানও নয়—একমাত্র 'মিশন' ক্ষমতা দখল। প্রয়োজনে এদের সাথে নিয়েই। এই আত্মঘাতী প্রকল্পের অংশীদার হয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু দলই। তবে এই আত্মঘাতী প্রকল্পের ক্ল্যাসিক উদাহরণ আমাদের রাজ্য। শুধুমাত্র বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এদের সাথে নিয়েই গড়ে উঠল রামধনু জোট। কে ছিল না সেই জোটে? এমনকি জঙ্গলের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা অসূর্যম্পর্শা আগুনখেকো বিপ্লবীর দল মাওকে টেনে আনলেন সাভারকারের পাশে!

আমাদের রাজ্যের পরিণতি তো আমরা দেখছি। দেশের অন্যান্য প্রান্তেও বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির উপরোক্ত নিস্পৃহতা, নিষ্ক্রিয়তা এবং ক্ষেত্রবিশেষে লোলুপতার কারণে জনমানসে এই বিপদ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট বা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠতে পারেনি। জনগণ কখনও এদের সমর্থন করেছেন, বা বিরোধিতা করেছেন শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দল ভেবেই। এরাও সেই সুযোগ নিয়ে জনগণের মধ্যে প্রবেশ করেছে ধারালো প্রচারের সাহায্যে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই প্রচারের দুটো দিক। একদিকে আর পাঁচটা দলের মতোই সাধারণ প্রচার। কিন্তু তার ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দেওয়া হয় মুখোশ নয়, মুখের উদ্দেশ্যগুলো।

সাধারণ প্রচারের ফাঁকে ফাঁকে অথবা সাধারণ প্রচারের অছিলায় গুঁজে দেওয়া উদ্দেশ্যমূলক প্রচারগুলো ধীরে ধীরে জনগণের চেতনা ও মননে অতীতে বিভিন্ন ঘটনাবলীর পারম্পর্যে সৃষ্ট, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় অবদমিত কিছু ভ্রান্ত ধারণাকে জাগিয়ে তোলে। অতঃপর এই ভ্রান্ত ধারণার ধূম্রজাল চেতনাকে আবিষ্ট করে আত্মঘাতী প্রবণতার দিকে প্ররোচিত করে। রিমোর্ট কন্ট্রোলার 'মুখ'-এর গেমপ্ল্যান কার্যকরী করার জমি উর্বরা হয়ে ওঠে।

বর্তমান পর্বে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, মানুষ কি সংগঠিতভাবে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ করছে না? হ্যাঁ করছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সংগঠিত বা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ যা কিছু হচ্ছে, তার সিংহভাগই দু-মুখো দানবের একটি মুখ দিয়ে নিঃসৃত জনবিরোধী অর্থনৈতিক নীতির আগুনের বিরুদ্ধে। আর একটি মুখ দিয়ে 'হিন্দুত্ববাদ'-এর যে গরল নির্গত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সমপর্যায়ের প্রতিবাদ কোথায়? সি এ এ-এন আর সি বিরোধী স্বতঃস্ফূর্তি প্রতিবাদ একমাত্র ব্যতিক্রম। বাকি যতটুকু হচ্ছে, তা করছে মূলত বামপন্থীরাই এবং কিছু ব্যক্তি। এক্ষেত্রে জনগণকে প্রতিবাদ আন্দোলনে শামিল করার দায়িত্ব পালনে বামবৃত্তের বাইরে থাকা প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই কার্যত ব্যর্থ। ব্যর্থ, তাদের সংশ্লিষ্ট অবস্থানগত দুর্বলতার কারণেই।

ফলে বিপদ এখন দরজায় কড়া নাড়ছে। বামপন্থীদের সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে দ্বি-মুখী দানবের দুটি মুখ দিয়ে নির্গত আগুন ও গরলের বিরুদ্ধেই লড়াইটা চালাতে হবে। চেষ্টা করতে হবে বৃত্তটাকে বড় করার। যারা কড়া নাড়ার শব্দ শুনেও না শোনার ভান করছে, তাদেরও দিবানিদ্রা থেকে জাগিয়ে লড়াইয়ের বৃত্তটাকে বড় করার আদর্শগত দায় বামপন্থীদেরই। কাজটা কঠিন। অতি কঠিন। কিন্তু দেশ, দেশের জনগণ ও সংবিধানকে রক্ষা করতে, হিন্দুত্ববাদের গর্ভে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিলীন করার ধ্বংসাত্মক উদ্যোগকে রুখতে বামপন্থীদেরই জাগ্রত বিবেকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। ইতিহাসের শিক্ষা তাই। □

১১ জুলাই, ২০২২

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার প্রয়াত

গত ৩ জুলাই, সকালে এস এস কে এম হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার। পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত মৃত্যুকালে তরুণ মজুমদারের বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। অসুস্থতার কারণে প্রায় কুড়ি দিন এস এস কে এম হাসপাতালের আই সি ইউ-তে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ঐ দিন সকাল ১১.১৭ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আজীবন বামপন্থী এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আপসহীন প্রতিবাদী চরিত্রের তরুণ মজুমদার চলে গেলেন বুকের ওপর লাল পতাকা আর গীতাঞ্জলী নিয়ে। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারেই ফুল, মালা আর আনুষ্ঠানিক শোকজ্ঞাপন পর্বকে বাদ দিয়ে তাঁর দেহ দান করা হয় চিকিৎসা গবেষণার স্বার্থে।

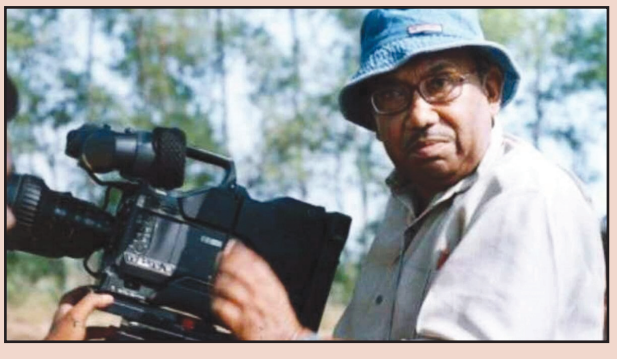

জাতীয় স্তরে চারবার সম্মানিত, পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত তরুণ মজুমদার চলচ্চিত্র পরিচালনার কাজ করেছেন পাঁচের দশকের শেষভাগ থেকে। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটকরা যখন ভারতীয় সিনেমায় নবতরঙ্গ নিয়ে এসেছেন, ঠিক সেই সময়েই নিজস্ব শৈলীতে সিনেমা তৈরি করে নিজের স্থান পাকা করে নিয়েছিলেন তরুণ মজুমদার।

তরুণ মজুমদারের ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সহজ সরলভাবে গল্প বলার দক্ষতা। পাশাপাশি শিল্প নৈপুণ্য, ক্যামেরার ব্যবহার, সম্পাদনা ও সঙ্গীতের প্রয়োগেও ছিল তাঁর মুন্সীয়ানা। তরুণ মজুমদার যখন সিনেমা বানানোর কাজ শুরু করেন তখন বাংলা চলচ্চিত্র দু'ধারায় বিভক্ত। একদিকে সমান্তরাল ছবি বা আর্ট ফিল্ম। যার পুরোভাগে তখন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক। অন্যদিকে মূলধারার ছবিতে তখন তপন সিংহ সুপরিচিত। তরুণ মজুমদার মূলধারার ছবিই বানাতে শুরু করলেন। তবে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে। শুরু করেছিলেন বাংলা ছবির জনপ্রিয়তম জুটি উত্তম-সুচিত্রাকে নিয়ে। কিন্তু দুটি ছবি বানানোর পরেই 'স্টার' নির্ভরতা ছেড়ে বেড়িয়ে আসেন। পরবর্তীকালে তাঁর ছবিতেই অভিনয় করে বহু নতুন মুখ চলচ্চিত্র জগতে প্রতিষ্ঠা পান। আলো, দাদার কীর্তি, ভালোবাসা ভালোবাসা, পলাতক, গণদেবতা প্রভৃতি ছবি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বামপন্থী মতাদর্শের প্রতি ছিলেন অবিচল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই বিশ্বাস থেকে তাঁকে কেউ টলাতে পারেনি। বামফ্রন্ট সরকার বিরোধী কুৎসা ও অপপ্রচারের প্রতিবাদ করেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। তাঁর মৃত্যুতে সংস্কৃতি জগৎ হারালো এক নির্ভীক সেনাকে। □

দৃষ্টি আকর্ষণ

গত এপ্রিল মাসে বিহারের বেগুসরাইতে অনুষ্ঠিত হয়েছে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সপ্তদশ জাতীয় সম্মেলন। এই সম্মেলন থেকে সহ-সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী এবং অন্যতম সহ-সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন সুতপা হাজরা। বিজয় শংকর সিনহা হয়েছেন জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য।

বিজ্ঞপ্তি

মে ২০২২ থেকে সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার নতুন গ্রাহক বর্ষ শুরু হচ্ছে। গ্রাহক সংখ্যা দ্রুত জানানোর জন্য জেলা ও অঞ্চল কমিটিগুলোকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

১২ই জুলাই কমিটির নবম কনভেনশন-এর প্রকাশ্য সমাবেশে উদ্বোধক হান্নান মোল্লার বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার

১৯৬৬ সালে গোটা রাজ্যজুড়ে বিরাজ করছিল এক অস্থির, অগণতান্ত্রিক পরিস্থিতি, একদিকে কংগ্রেস সরকারের জনবিরোধী নীতির কারণে তৈরি হয়েছিল খাদ্যের সঙ্কট। মানুষের জীবনধারণ দুঃসহ হয়ে পড়ছিল। এর বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ তৈরি হচ্ছিল। গণতান্ত্রিক শক্তির পতাকাতলে মানুষ লড়াই আন্দোলনে সামিল হচ্ছিলেন। ছাত্রসমাজ খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আন্দোলন গড়ে তোলেন। পুলিশের গুলিতে নুরুল ইসলাম আনন্দ হাইত খুন হন। গোটা রাজ্যেই তৈরি হয় এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। এই উত্তাল সময়ের গর্ভে আত্মপ্রকাশ করে শ্রমিক কর্মচারী শিক্ষকদের যুক্ত আন্দোলন মঞ্চ ১২ই জুলাই কমিটি। যুক্ত সংগঠন গড়ে তোলার প্রাকপর্বে সরকারী কর্মচারীরা বীরত্বের সঙ্গে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। শিক্ষক আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের আক্রমণ, রাজ্য সরকারের আক্রমণ, গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে ১২ই জুলাই কমিটির নেতৃত্ব যৌথ আন্দোলন রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করে। কেজিদা (কেজি বসু), অরবিন্দদা (অরবিন্দ ঘোষ) ১২ই জুলাই কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আমি তখন ছাত্র হিসাবে বিভিন্ন সময়ে ডাক পেলে ১২ই জুলাই কমিটির পতাকাতলে লড়াই-আন্দোলনে যুক্ত হতাম। সংগ্রামের এই যুক্ত মোর্চা রাজনৈতিক আন্দোলনকে গুণগতভাবে পরিপুষ্ট করে। জনবিরোধী কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ধার বাড়িয়ে তোলে। আজকে যখন আমরা এই কনভেনশনে মিলিত হয়েছি, তখন অরাজকতার শিকার কর্মচারী শিক্ষক সমাজ। শিক্ষক নিয়োগ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি হচ্ছে। নতুন কর্মচারী নিয়োগ হচ্ছে না, অবসর হলে পদ অবলুপ্ত করে দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই এম এফ-এর ফরমূলা অনুসরণ করার কারণে আগামী দিনে আর সরকারী কর্মচারী বলে কিছু থাকবে না। সরকারেরই প্রাইভেটাইজেশন হয়ে যাবে হয়তো। NLP (New Liberal Policy) সবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে আগের থেকেও উগ্রভাবে মোদি সরকারের সময়কালে। পাবলিক সেক্টর বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে যা স্বাধীনতা পরবর্তীতে ৭০ বছর ধরে গড়ে উঠেছিল। যেগুলি ছিল শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের মাধ্যম। রেল, প্রতিরক্ষা, তৈল ক্ষেত্র, টেলিকম---সমস্ত ক্ষেত্রেই বেসরকারীকরণের মধ্য দিয়ে ৩০ হাজার কোটি টাকা সরকারী তহবিলে নেওয়ার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে সরকারী বাজেট প্রস্তাবে।

স্বাভাবিকভাবেই আত্মনির্ভরতার বুনিয়াদ ধসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্থায়ী নিয়োগের পরিবর্তে চুক্তিতে নিয়োগের প্রবণতা বাড়ছে। কম লোক দিয়ে বেশি কাজ করানো হচ্ছে। সরকারী দপ্তরেও এই প্রবণতা বাড়ছে। শিক্ষাক্ষেত্রকেও বেসরকারীকরণ করে দেওয়া হচ্ছে। চুক্তিতে শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে।

এখানে আপনারা যারা উপস্থিত আছেন তারা মধ্যবিত্ত অংশ, যারা চিন্তাভাবনা করেন। ভেবে দেখুন ৭৫ বছরে গড়ে তোলা শিল্প, উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যা আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পেয়েছিলাম তা তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অর্থনীতি ক্ষেত্রে এক শতাংশ কর্পোরেটদের হাতে ৭৫ শতাংশ সম্পদ।

কোভিড পরিস্থিতিতে যখন লক্ষ লক্ষ লোক কাজ হারালো, রাস্তায় প্রাণ দিল তখন কর্পোরেটদের মুনাফা বাড়ল ৩০০ থেকে ৭০০ গুণ। এরকম পরিস্থিতিতে কর্মচারী শিক্ষক আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাঁচতে গেলে লড়তে হবে। এছাড়া পথ নেই। পুরোনো সবকিছু বাতিল করে দিতে চাইছে বর্তমান এন ডি এ সরকার। পার্লামেন্ট থেকে কিছু পাওয়ার নেই। জনকল্যাণমুখী কিছু ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হচ্ছে না। প্রশাসন থেকে নির্বাচন কমিশন শাসকশ্রেণীর আজ্ঞাবহ ভূমিকা পালন করছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মূল কাজ থেকে তার ভূমিকা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে। এল আই সি যা আমাদের আস্থা ভরসার জায়গা, যা রাষ্ট্রকে বাৎসরিক গড়পড়তায় এক লক্ষ কোটি টাকা দিত, তার শেয়ার বিক্রি করার মধ্য দিয়ে একে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিহাসকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা, স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা হচ্ছে। যে বিজেপি-আর এস এস স্বাধীনতা আন্দোলনে দালালের ভূমিকা পালন করেছিল তারা দেশপ্রেমি সাজতে চাইছে।

পাঠক্রম নতুন করে তৈরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে আন্দোলন সংগঠন পরিচালনা করতে হবে। কর্মসংস্থানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন টেম্পোরারি / ক্যাজুয়াল নিয়োগ, যার মধ্য দিয়ে ৯৪ শতাংশ শ্রমিকরাই অসংগঠিত। কোনো শ্রমিকই স্থায়ী নয়। কারণ অস্থায়ী শ্রমিক লড়াই করতে পারবে না। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে কী করে দাঁড়াব?

দীর্ঘদিনের চেষ্টার মধ্য দিয়ে যে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল ধর্মকে ব্যবহার করে তাকে ভেঙে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। ধর্মের অপব্যবহার করে দেশ চালানোর নীতি নেওয়া হচ্ছে।

১৯২৫-এর নাগপুরিদের তত্ত্ব, হিন্দু রাষ্ট্র গঠন করার শ্লোগানকে সামনে আনা হচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে হিন্দু আর হিন্দুত্ব এক নয়। হিন্দু হাজার বছরের ধর্ম আর হিন্দুত্ব হল রাজনীতি। মানুষও বিভ্রান্ত হচ্ছেন।

গত ৮ বছরে কোনো সাফল্য নেই। ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি খাতাতেই রয়ে গেছে। শিক্ষায় অধোগতি নেই। শ্রমিক-কৃষকরা দিন দিন আরও ঋণগ্রস্থ হচ্ছেন আর সম্পদের পাহাড় চূড়ায় আদানি-আম্বানীরা আরোহন করছেন। চা বেচা দিয়ে শুরু করে মোদিজি দেশ বেচে দিয়ে যাবেন। কর্মসূচীর কথা বলে ক্ষমতায় থাকা যাবে না। তাই ধর্ম /জাতপাতকে ব্যবহার করা। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে ধর্মকে ব্যবহার করার ফলে পাকিস্তান (ইসলাম), শ্রীলঙ্কা (বৌদ্ধিষ্ট)-এর অবস্থা আমরা দেখছি।

মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবীদের মেরুদণ্ড ভেঙে যাচ্ছে, বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে লড়তে হবে। লড়াইয়ের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। পুনর্গঠিত আন্দোলন-সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করতে হবে। আলোচনা করতে হবে আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য স্ট্র্যাটেজি কী হবে। ১২ই জুলাই কমিটি একটা প্ল্যাটফর্ম, যাকে আমাদের সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। কৃষকের সর্বনাশ করার লক্ষ্যেই মোদি তিন কালা আইন এনেছিল। প্রথমে পার্লামেন্টে অর্ডিন্যান্স পরবর্তীতে রাজ্যগুলিতে অর্ডিন্যান্স। ৪ লক্ষের বেশি কৃষক মৃত গত কয়েকবছরে। মূল কারণ চাষের ক্রমবর্ধমান খরচের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে উৎপাদিত ফসলের সঠিক দাম না পাওয়া। অর্ধেকের বেশি কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন দেনার দায়ে।

আমাদের স্মরণে রাখা দরকার কাপড় বা তুলো কয়েকদিন না থাকলে কেউ মারা যাবে না, কিন্তু অন্নদাতা কৃষকেরা না থাকলে, ভাত-রুটি না থাকলে মানুষ অনাহারে মারা যাবেন। আমাদের দেশে প্রতিদিন গড়ে ৫২ জন কৃষক আত্মঘাতী হন। দেশের জনসংখ্যার ৬০ ভাগের বেশি কৃষক। তাহলে প্রশ্ন হল অন্নদাতা কৃষক কেন আত্মহত্যা করবে? বিশিষ্ট সাংবাদিক পি সাইনাথ প্রথম আত্মহত্যার বিষয়টি তোলেন। বিভিন্ন রাজ্যজুড়ে তথ্য সংগ্রহ করে দেখা যায় ফসলের দাম না পাওয়া, দেনার দায়, সুদখোরের চাপই এই আত্মহত্যার কারণ।

আমাদের দেশে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি লোন পায়। কিন্তু এগ্রিকালচার পায় না। গাড়ি কেনার জন্য সুদের হার ৮ শতাংশ। কিন্তু কৃষককে দিতে হয় ৬০-৭০ শতাংশ সুদ। সমস্ত কৃষক পরিবারগুলি দিনে ১৮ ঘণ্টা কাজ করে, উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ফসল ফলায় কিন্তু বিনিময়ে ফসলের ন্যূনতম মূল্য তো দূরঅস্ত দেনার দায়ে সর্বসান্ত হয়ে যায়।

দেশের সরকার ৬-৭ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুব করে কর্পোরেটদের। বহু ব্যবসায়ী টাকা মেরে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কৃষকদের ক্ষেত্রে সরকার উদাসীন। আমরা দাবি করেছিলাম কৃষকদের ক্ষেত্রে একবার কর মুক্ত করা হোক। কিন্তু হল না। মোদি বললেন কৃষকদের সমস্যা সমাধান করবেন। কিন্তু করলেন না। কৃষি আগে ছিল সমস্যা, এখন হচ্ছে সঙ্কট। ফসলের ন্যায্য দাম, ঋণমুক্তি না ঘটলে এই সঙ্কট কাটবে না।

বিখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী স্বামীনাথনের নেতৃত্বে যে কমিশন গঠিত হয়েছিল তারা তাদের রিপোর্টে বলেছিলেন, প্রথমেই যেটা করা দরকার, আগে ফসলের দাম দেড়গুন ধার্য করতে হবে। অর্থাৎ চাষ করতে কৃষকের ১০০ (একশত) টাকা খরচ হলে ১৫০ (এক শত পঞ্চাশ) টাকা দাম নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু স্বামীনাথন কমিশনের কোনো সুপারিশই দেশের সরকার মানেননি। মিথ্যা কথা বলে ক্ষমতায় এসে সরকার গড়ার পর কৃষকদের কথা আর মনে থাকে না।

ফসলের দাম ঠিক করে কে? সিএসিপি ফসলের দাম ঠিক করে। ২৩টি পণ্যের ক্ষেত্রে যে ঘোষণা তা ঘোষণাই থাকে। কৃষকেরা ঘোষণা অনুযায়ী দাম পায় না। শুধুমাত্র ধান আর গম কিছুটা পায়, তাও দেশের অল্প ক'টি রাজ্যে। মূলত পাঞ্জাব আর হরিয়ানার কৃষকরা পায়। কারণ এখানে মাণ্ডিতে ধান আর গম ক্রয় করা হয়, যা মোট কৃষকের ১২ শতাংশ থেকে ১৩ শতাংশে। বাকি ভারতবর্ষে যেখানে চাষের খরচ ২২০০ টাকা প্রতি কুইন্টালে হলে শতকরা ৮৫ শতাংশ ১২০০-১৩০০ টাকা কুইন্টাল প্রতি বিক্রি করতে কৃষকেরা বাধ্য হচ্ছেন। এক বছর লোকসান করা যায়, দু'বছর লোকসান করা যায়---কিন্তু বার বার লোকসান করা সম্ভব নয়। কৃষকের সন্তানরা আর কৃষক হতে চাইছেন না। তারা মুট বইতেও রাজি। কৃষকরা সরকারের কাছ থেকে সহায়ক মূল্য দূরে থাক, চাষের খরচও না পেয়ে কর্পোরেটদের কাছে লোকসানে কৃষিপণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। এরকম এক পরিস্থিতিতে ৫০০টির বেশি কৃষক সংগঠন একযোগে লড়াইতে নামে ২০২০ সালে নভেম্বর মাস থেকে। ২৬ নভেম্বর ২০২২ তারা দিল্লী যাওয়ার ডাক দেয়। সরকার বলল আসতে পারবে না। তারা রাস্তা কেটে দিল। জাতীয় সড়ক তিন ফুট কেটে দেওয়া হল। রাস্তায় কংক্রিটের দেওয়াল তুলে দেওয়া হল। কিন্তু আমাদের ডাক ছিল শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের। কৃষকরা পাঁচটি জাতীয় সড়কের প্রবেশ পথে বসে পড়লেন। তাপমাত্রা যখন শূন্য ডিগ্রীতে, যখন দিল্লীর মানুষ বন্ধ ঘরে লেপ কাথা মুড়ি দিয়ে দিয়ে শুয়েও ঠাণ্ডায় কাঁপছেন, সে সময় পরিবার সহ কৃষকেরা খোলা আকাশের নিচে বিনিদ্র রাত্রিযাপন করেছেন কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে। আবার তাপমাত্রা যখন আটচল্লিশ ডিগ্রীতে, দিল্লীর সরকারী বড় বড় দপ্তরগুলিতে এবং অভিজাত আবাসনগুলিতে মানুষ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় রয়েছেন, তখনও তীব্র দাবদাহে অন্নদাতারা পরিবার নিয়ে রাস্তায় বসে থেকেছেন।

প্রথম প্রথম সরকারের পক্ষ থেকে চিঠি আসতো আলোচনার জন্য। পরবর্তীতে সংশোধনের প্রস্তাব আসতে শুরু করল, যা ছিল কৃষক নির্ভরতার পরিবর্তে কর্পোরেট নির্ভরতা। কৃষক সমাজও ঐক্যবদ্ধ ছিল—মরে যাব, কিন্তু আন্দোলন ছাড়ব না।

দেশের প্রধানমন্ত্রী এক বছরের আন্দোলনে কালা কিছু দেখলেন না, কিন্তু যেই উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন সামনে আসল অমনি তিনি আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা করলেন। একধাপ এগোন গেছে, কিন্তু এম এস পি পেলাম না, তাই দ্বিতীয় ধাপে যেতে হবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ আন্দোলন যেখানে ৫০০টি সংগঠন একসঙ্গে এক বছর ধরে পথে রয়েছেন। আমাদের পাকিস্তানী, খালিস্তানী, চিনের দালাল বলা হয়েছে। আন্দোলন দেশবিরোধী বলা হয়েছে, ২৬শে জানুয়ারি লালকেল্লার ঘটনা, ৪৬ হাজার মামলা হয়েছে, ৭১৫-র অধিক কৃষক প্রাণ হারিয়েছেন, তবুও আন্দোলন হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে, ঐক্যবদ্ধভাবে। কৃষক আন্দোলন ঐতিহাসিক আন্দোলন---যেখানে সরকারকে পিছু হঠতে হয়েছে। ৫৬ ইঞ্চির ছাতি ৬ ইঞ্চি হয়তো হয়েছে। নোয়াম চমস্কি বলেছেন—দিল্লীর বুকে কৃষক আন্দোলন পৃথিবীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে আলোকবর্তিকা। তিনটি বন্ধ হয়েছে। রাস্তা রোকো, রেল রোকো হয়েছে। গোটা দেশের মানুষ সমর্থন করেছেন। শ্রমিক-কৃষক মৈত্র আন্দোলনের উত্তাপ বাড়িয়েছে। এতদিন একা লড়লে অন্যরা দেখতো—এই প্রথম শ্রমিক-কৃষক একসঙ্গে লড়াই আন্দোলন হরতাল করেছে।

কৃষকদের এক বৃহৎ অংশই মহিলা। যার স্বীকৃতি ছিল না, এবারে তারাও একযোগে লড়াই করেছে। মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু রাস্তা থেকে সরেনি। ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলন মোদি সরকারের অপরাজেয় মিথ ভেঙে দিয়েছে। এই সরকারের বিরুদ্ধে জেতা যাবে না ভাবতো যারা, তারাও নতুন করে ভাবছে। দেশের শ্রমিকরাও আজ ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত। ৪৪টি আইনকে বাতিল করে ৪টি লেবার কোড চালু করা হচ্ছে। এগুলি আসলে কোম্পানী কোড। কৃষক আন্দোলনে শিক্ষাকে সামনে রেখে শ্রমিকদেরও এগোতে হবে। চাই ব্যাপকতর ঐক্য---সঠিক ইস্যুভিত্তিক ঐক্য। ডান-বাম নির্বিশেষে কোনো অচ্ছুৎপনা করলে হবে না। সমস্ত নাগরিককে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। চাই লক্ষ্যে ঐক্য। কাজের ঐক্য। ইমানদারির ঐক্য। ইস্যুভিত্তিক সমর্থন যারা করবেন, আন্দোলন যারা করবেন সকলকে এক করতে হবে।

এস কে এম-এর মিটিং হবে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে। ৭ জনের আমাদের কমিটি আছে। কিন্তু গোটা দেশের কৃষকরা ঠিক করবেন পরবর্তী পদক্ষেক কী হবে? সব আন্দোলন একইরকমভাবে হয় না তার ফর্ম চেঞ্জ হয়। শত্রুর প্রতি ঘৃণাকে আন্দোলনের ফসল করতে হবে। গোটা দেশের মানুষের সমর্থন চাই। শ্রমিক-কৃষকের আরও দৃঢ় ঐক্য চাই। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে কৃষক আন্দোলন নতুন দিশা হলেও কর্পোরেট কমিউনাল ফ্যাসিস্টিক সরকার দেশ চালাচ্ছে। এই রাজ্যেও রয়েছে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার। আমাদের রাজ্যের সরকার আমার ভাষায় Of the Criminal / For the Criminal / By the Criminal। কখন কার পদ চলে যাবে, বরখাস্ত হবে, এমনকি মন্ত্রীর চাকরিও চলে যাবে কিনা ঠিক নেই। আমাদের বিকল্পের লড়াই করতে হবে।

২২টি সংগঠন নিয়ে ১২ই জুলাই কমিটি। আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে যারা এখনো বাইরে আছে তাদেরকে যুক্ত করে পরিস্থিতি পরিবর্তনের লড়াই করতে হবে। গোটা দেশ তথা রাজ্যজুড়ে যে অসহিষ্ণুতা, ঘৃণার ভাষণ চলছে এর বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে হবে। কর্মক্ষেত্র থেকে রাজ্য তথা দেশের পরিস্থিতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রত্যেককেই ইমানদারির সাথে মানুষের আন্দোলন যুক্ত হতে হবে। নয়া অশিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র ও শিক্ষক সমাজ লড়াই করছে। অর্থনৈতিক অধিকার পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। আরও জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে শুধু কর্মসূচী পালনকেই আন্দোলন বলে না। আন্দোলন পরিচালন করতে হবে লক্ষ্যকে স্থির রেখে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত। সংগ্রামের প্রস্তুতি প্রয়োজন। বিগত দিনে ১২ই জুলাই কমিটির নেতৃত্বে জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পরিস্থিতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে। আগামী দিনেও পরিস্থিতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে আন্দোলনের রূপরেখা নির্ণয় করতে হবে। শিক্ষক আন্দোলন / ছাত্র আন্দোলন সরকারকে কোণঠাসা করছে। এখন কাজ ব্যাপকতর মানুষকে সমবেত করে সরকারকে তার নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করা। তার জন্য চাই এমন আন্দোলন যা শত্রুর বুকে কাঁপন ধরাবে / বন্ধুর বুকে সাহস জোগাবে। □

দেবাশীষ রায়

আমাদের সত্যজিৎ রায়

শাশ্বতী মজুমদার

১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত নট ও নাট্যকার শিশির কুমার ভাদুড়ীর ভাই মুরারী ভাদুড়ীকে লিখেছিলেন, ''ছায়াচিত্র এখনও সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে। তার কারণ কোনো রূপকার আপন প্রতিভার বলে এই দাসত্ব থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারেনি।'' তখন তিনি জানতেন না তাঁর সুহৃদ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নাতি, তাঁর স্নেহভাজন প্রতিভাশালী অকালপ্রয়াত সুকুমার রায়ের যে শিশুপুত্রটি ছ'বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে তাঁর সঙ্গে দেখা হবার সুযোগে অটোগ্রাফের জন্য নোটবুক বাড়িয়ে দিয়েছিল তাঁর দিকে আর তিনি তাতে লিখে দিয়েছিলেন, ''বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে / বহুব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে / দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা / দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু। / দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া / ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া / একটি ঘাসের শিষের উপরে / একটি শিশির বিন্দু।'' সেই শিশুটিই ভবিষ্যতে হয়ে উঠবেন 'রূপকার', মুক্ত করবেন এদেশের চলচ্চিত্রকে গতানুগতিকতার দাসত্ব থেকে। তাঁর নিজের মতোই সেই শিশুও একদিন বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিকে পৌঁছে দেবে বিশ্বের কাছে, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের যা কিছু মহৎ, যা কিছুতে মানবতার উৎসার, বাংলার নবজাগরণের আলোকপ্রাপ্ত আধুনিকতার ধারা অনুসরণ করে তাকে নিজের আজীবনের বহুধাবিস্তৃত কর্মপরিসরে সযত্নে রোপনের চেষ্টা করে যাবে এবং নিজেই শালপ্রাংশু হয়ে উঠবে, যে মহীরূহকে দেখে আবিশ্ব আগ্রহে-বিস্ময়ে-সম্ভ্রমে ফিরে তাকাবে, বিজয়মালা পরানোর অপেক্ষায়। শুধু তাই নয়, মৃত্যু এসে যখন তাঁকে কেড়ে নেবে তারপরও বহু বহুদিন তাঁর সৃষ্টির কাছে মানুষকে বার বার ফিরে যেতে হবে।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার শ্যাম বেনেগাল অনেক সময়ে বলতেন, ফিল্ম দু-রকমের, সত্যজিৎ রায় পূর্ব এবং সত্যজিৎ রায় পরবর্তী। ঋত্বিক ঘটক লিখেছেন, পথের পাঁচালী তিনি পরপর সাতবার দেখেন। ''যা আমি হাজারবার কল্পনা করেছি, স্বপ্ন দেখেছি, উনি সেটা সাজিয়ে-গুছিয়ে খেটে তৈরি করে ফেলেছেন। মারাত্মক এবং বৈপ্লবিক তফাৎ। যে তফাৎ ওঁকে আমাদের নবযুগের স্রষ্টার আসনে বসিয়ে দিল।''

এই নতুন ধারার ভারতীয় সিনেমার বৈশিষ্ট্য হল সংক্ষেপে সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতনতা এবং চলচ্চিত্রের নতুন ভাষা অনুসন্ধান, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন ''সাহিত্যের চাটুবৃত্তি' থেকে মুক্তি। ভারতে সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার ছবি কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র অনেক আগেই হয়েছে। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের জন্য খাজা আহমেদ আব্বাস ১৯৪৩-এর বাংলার দুর্ভিক্ষ্য নিয়ে 'ধরতি কে লাল' (১৯৪৫) ছবি করেছেন, ১৯৪৬ সালে ম্যাক্সিম গোর্কির 'লোয়ার ডেপথস্'-এর প্রেরণায় কেতন আনন্দ তৈরি করেছেন 'নীচানগর'। এগুলি ছিল বিষয়বস্তুতে নব্য বাস্তবধর্মী, কিন্তু সিনেমা তৈরির কৌশলের দিক থেকে, নতুন ভাষা তৈরির ক্ষেত্রে ততটা অগ্রসর হতে পারেনি। আসলে এই দিক থেকে 'পথের পাঁচালী' ছিল টাটকা বাতাস।

ছবি তৈরির শিক্ষা সত্যজিতের হলিউডের ছবি দেখে, ইতালীয় নব্যবাস্তবধর্মী ছবির প্রভাবও তাঁর ওপর রয়েছে। প্রথম লন্ডনে গিয়ে ভিত্তোরিও ডি সিকার 'বাই সাইকেল থিভস্' প্রথম দেখার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তিনি বহু সাক্ষাৎকারে। ইউরোপীয় ছবির জগতের দিকপালদের পরীক্ষানিরীক্ষা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। আইজেনস্টাইনের বিষয়বস্তুকে প্রকাশের পদ্ধতি এবং অন্যান্য সোভিয়েত চলচ্চিত্র পরিচালকদের কাজ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু এই ধরনের ছবি বানানোর জন্য রীতিপদ্ধতি নিয়ে চর্চা দরকার এবং অবশ্যই দরকার সুশিক্ষিত দর্শক। তাই ১৯৫৫ সালে প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' করলেও ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি তৈরি করেছেন অনেক আগে ১৯৪৭ সালে, পরিচালক ও চলচ্চিত্র সমালোচক চিদানন্দ দাশগুপ্তের সঙ্গে। চিত্র পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্তের স্মৃতিকথায় সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে ফিল্ম সোসাইটির মিটিংয়ের প্রথম দিনগুলির বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া চলচ্চিত্র নিয়ে এই সময় থেকেই তিনি ইংরেজি এবং বাংলায় ক্রমাগত লিখে গেছেন সারা জীবন। মেনস্ট্রিম ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির লোকজন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা গ্রহণ করতে পারেনি। তবু এই কাজের মূল্য তাঁর নিজের কাছে খুব পুরস্কার ছিল। তাই তিনি হাল ছাড়েননি। এর ফল নিশ্চয়ই হয়েছিল। সিনেমা নিয়ে সুস্থ বিতর্কের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। মৃণাল সেনের 'আকাশ কুসুম'কে ঘিরে তাঁর সঙ্গেই মৃণাল সেনের যে পত্র-বিতর্ক হয়েছিল সে সময়ে 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকতায় তা চলচ্চিত্র চর্চায় এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে ১৯৯৭ সালে সেটি কান চলচ্চিত্র উৎসবের ব্রোশিওরে প্রকাশিত হয়। সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে ভাবা, নতুন ধরনের কাজই শুধু করা নয়, তা কী করে গ্রহণযোগ্য করা যায় তা নিয়ে নিরন্তর চিন্তাভাবনা, সমমনস্ক অনেককে একত্রিত করে সাংগঠনিক উদ্যোগ নেওয়া—এসবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা এবং কাজের অনুরণন পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথকে যেমন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাষা-আঙ্গিক তৈরি করে নিয়ে পথ কেটে পথ চলতে হয়েছিল, সত্যজিৎকেও সিনেমার ক্ষেত্রে তাই করতে হয়েছিল। কিন্তু সত্যজিতের ছবিতে মধ্যবিত্ত জীবন যেভাবে এসেছে, ইতালীয় নব্যবাস্তবধর্মীতে শ্রমিক শ্রেণীর বাস্তব অবস্থা প্রকাশের যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, সত্যজিতের ছবিতে তা আসেনি এ আলোচনাও হওয়া দরকার। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের মতোই তাঁর মনে হয়েছিল ''অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়। / পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার, / বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।''

সত্যজিতের ছবি যারা প্রথম থেকেই সাদরে গ্রহণ করেছিলেন এদেশে প্রগতিশীল শিক্ষিত সমাজের একটি অংশ। চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদারের একটি সাক্ষাৎকারে এক চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যায়। 'পথের

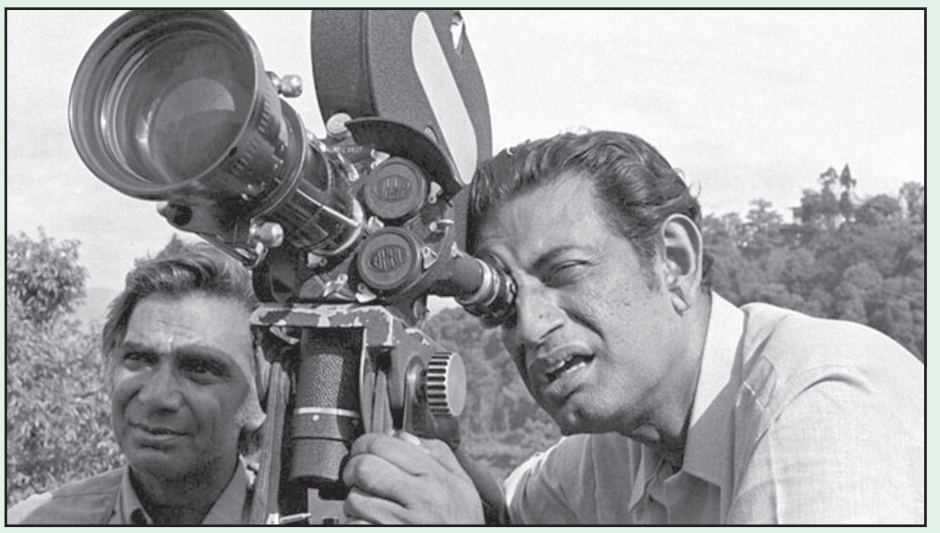

পাঁচালী' দেখে তরুণ মজুমদার এবং তাঁর বন্ধুরা বিস্ময়বিহ্বল হয়ে যান, তারপরেই আশঙ্কা গ্রাস করে যে এই সিনেমা চলবে না। তখন তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রচারের জন্য এক বিচিত্র উদ্যোগ নেন। উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্ক থেকে তাঁরা ১০/১২ জন মিলে চাটাইয়ের ওপর কাগজ সেঁটে দরমায় লাগিয়ে প্ল্যাকার্ড তৈরি করে তাই নিয়ে মিছিল শুরু করেন। প্ল্যাকার্ডে আলতা দিয়ে লেখা ছিল 'পথের পাঁচালী দেখুন। পথের পাঁচালী দেখা আমাদের কর্তব্য।' মিছিলে কোনো স্লোগান ছিল না। হাতিবাগান হয়ে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট ধরে সেই মিছিল চলতে চলতে প্রায় ৭০ জন মানুষ যোগ দেন সেই মিছিলে। পৃথিবীতে এরকম কোনো মিছিল আর হয়েছে কিনা জানা নেই। মিছিলটির প্রস্তাব এবং নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিখ্যাত শ্রমিক নেতা সুনীল মৈত্র। এর বিপরীও আছে। ১৯৮০ সালে অভিনেত্রী নার্গিস দত্ত যখন কংগ্রেসের সাংসদ তিনি বলেছিলেন, সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবিতে বিদেশে এদেশের 'দারিদ্রকে রপ্তানি' করেন।

সত্যজিৎ সম্পর্কে আরও একটি অভিযোগ তাঁর জীবৎকালে বার বার উঠেছে। রাজনৈতিক বক্তব্য তাঁর ছবিতে তিনি এড়িয়ে চলেন। ১৯৮২ সালে শিকাগোর বিখ্যাত ফিল্ম পত্রিকা সিনিয়েস্ট (Cineaste)-এ একটি সাক্ষাৎকারে তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর জবাব ছিল—''I have made political statements more clearly than anoyone else, including Mrinal Sen.'' পরবর্তীকালে সমালোচকরা অনেকেই বলেছেন তাঁর এ দাবি ভ্রান্ত নয়। সত্যজিৎ ছবি করেছেন মোট ৩৬ বছর ধরে। এই সময়টাকে মোটামুটি চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—(১) ১৯৫৫-৬৮ সাল, (২) ১৯৬৯-৭৫ সাল, (৩) ১৯৭৬-৮৭ সাল, (১৯৮৮-৮৯-তে কোনো ছবি করেননি), (৪) ১৯৯০-৯১ সাল।

প্রথম পর্যায়ের ছবি অপু ট্রিলজিতে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসার ইতিবৃত্ত। 'পথের পাঁচালী'র শেষে ভিটে ছেড়ে হরিহরের চলে যাওয়ার মর্মস্পর্শী দৃশ্যে কোথাও হয়তো দেশভাগের ছিন্নমূল মানুষকে মনে করায়, কারণ কলকাতার রাস্তায় প্রতিদিন উদ্বাস্তু জীবন দেখা তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলছিল বলে তিনি বলেছেন, কিন্তু ছবিতে স্বাধীনতার মতো রাজনৈতিক ঘটনারও কোনো আভাস নেই। 'অপরাজিত'য় আবার গ্রামে ফেরা, শেষে অপু বরাবরের মতো শহরে চলে আসে। এতদিন বাদে সারা পৃথিবীজুড়ে নানা কারণে ছিন্নমূল হওয়া মানুষ, কাজের খোঁজে শহরে আশ্রয় নেওয়া মানুষের নিরুপায় অবস্থার কথা ভাবলে হরিহর-সর্বজয়া-অপুর কাহিনী স্থান-কাল পেরিয়ে সর্বজনীন ক্যানভাস পেয়ে যায়। কোভিড লকডাউনে এরকম মানুষদের পরিযানই তো আমরা দেখলাম। 'অপুর সংসার'—এই প্রথম সত্যজিতের ছবিতে দেখা যায় কাজের দাবিতে মিছিল। লক্ষণীয়ভাবে অপু সেই মিছিলের অংশ নয়। কিন্তু সত্যজিৎ নিজে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলনে মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন, জানা যায়।

'দেবী'র গল্প ঊনবিংশ শতকের কিন্তু সত্যজিৎ বলেছিলেন, ছবি বাছাই করার সময়েই খবরের কাগজে সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে একটি মেয়ের ওপর দেবিত্ব আরোপ করার ঘটনা পড়েন যেখানে বহু মানুষের সমাগম হতে থাকে এবং একদিন কোনো উৎসবে ভিড়ের চাপে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। আমরা জানি আজও এরকম ঘটনা ঘটে। তিনি জানতেন অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই কত কঠিন। ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ছবিটি বিদেশে প্রদর্শনের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছিল, কারণ তাতে নাকি ভারতীয় ঐতিহ্য কালিমালিপ্ত হবে! পরে নেহরুর হস্তক্ষেপে ছবিটি ছাড়পত্র পায়।

এই পর্বের ছবিগুলিতে সামাজিক বিষয়গুলি এসেছে, কিন্তু সেগুলি কোনো স্থির বিন্দুতে দাঁড়িয়ে থাকে না। তাদের মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে আছে পরিবর্তনশীলতা। 'মহানগর'-এ মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি বধূ চাকরি করতে যাচ্ছে, আরেকটি মেয়ের যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে সে দৃঢ়তার সঙ্গে রুখে দাঁড়াচ্ছে। এত বছর আগে এইরকম অগ্রসর ভাবনা, আমাদের বিস্মিতকরে। মহানগরেই কিন্তু শহরে বেকারি দেখানো হয়েছে, কিন্তু তখনও 'এত বড় শহরে ঠিক কোনো না কোনো কাজ পাওয়া যাবে' মনে করে হচ্ছে। 'নায়ক'-এ মূল কাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে রয়েছে অরিন্দমের বন্ধু বীরেশের গল্প। শ্রমিক আন্দোলনের নেতা বীরেশ জেল থেকে ফিরে দেখে, অরিন্দম বিখ্যাত নায়ক। বীরেশ চায় যে ধর্মঘটী শ্রমিকদের সামনে গিয়ে কথা বলে শ্রমিকদের উদ্দীপ্ত করুক। কিন্তু অরিন্দম পিছিয়ে আসে। সেদিনও যেমন কোনো কোনো অভিনেতা নিজেকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে রাখতেন বা কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে হাত মেলাতেন, আজকের 'বুদ্ধিজীবী'দের বড় অংশই কি সেভাবে নিজেদের সমাজবিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীতে পরিণত করছেন না শাসকের পদলেহন করে? সত্যজিৎ কিন্তু বামপন্থীদের ডাকে মানুষের জন্য রাস্তায় মানুষের মিছিলেও হেঁটেছেন। যখন অত্যন্ত কাজে ব্যস্ত, সশরীরে থাকতেন পারছেন না, তখন সভাপতি হিসাবে তাঁরও যাতে আন্দোলনে কিছু ভূমিকা থাকে সেজন্য অনুপকুমার বা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো বামপন্থী সংগঠকদের ডেকে প্রচার ও অর্থসংগ্রহে সহায়তার জন্য 'আবেদন পত্র' লিখে দিয়েছেন। রাজনীতি এড়িয়ে যাননি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক বার্তা আরও স্পষ্টভাবে এসেছে। ১৯৬৮-তে 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'-এ রূপকের আড়ালে যুদ্ধ কেন হয় বলছেন। মনে রাখতে হবে এই সময়েই আমাদের দেশ প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে, ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলছে। সত্তর দশকের আধা ফ্যাসিবাদী আক্রমণ এবং জরুরি অবস্থার সময়ে করা 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৯৭০), 'সীমাবদ্ধ' (১৯৭১), 'জন অরণ্য' (১৯৭৫)—তাঁর যে তিনটি ছবি 'ক্যালকাটা ট্রিলজি' নামে পরিচিত তাতে রাজনীতি আরও স্পষ্ট। ভেঙে পড়া অর্থনীতি, তীব্র বেকারী, স্বাধীনতার মোহমুক্তি, হতাশা, সামাজিক অবক্ষয়, নারীর পণ্যায়ন, নির্বাচিত জন প্রতিনিধির মিথ্যাভাষণ, একদল তরুণ যুবকের খতমের রাজনীতিকে বেছে নেওয়া, শ্রমিকদের ঠকানো—এর কোনোটি আজও প্রাসঙ্গিক নয়? তিনিই তো সীমাবদ্ধতে দেখালেন উচ্চকাঙ্খা, লোভ শুধু ব্যক্তির অধঃপতনে সীমাবদ্ধ থাকে না, পুঁজির স্বার্থে শ্রমিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে মদতও যোগায়। জন অরণ্যতে গণটোকাটুকির দৃশ্য দেখে আজও চমকে উঠতে হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার ভেঙে পড়া আর কর্মহীন বেকারদের বিপথগামিতা দেখিয়ে তিনি কি এই ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাসই টলিয়ে দিতে চান না? পাশাপাশি এও বলতে হবে, এই সময়ের ছবিগুলিতে সমাজের অন্ধকার, অবক্ষয় তিনি দেখাচ্ছেন কিন্তু তীব্র গণ আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের প্রতিফলন এই ছবিগুলিতে ঘটছে না। বামপন্থী মহলে এই সমালোচনা ছিল। এমনকি 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে জনৈক নার্সকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন প্রতিবাদ জানিয়েছিল। পরে সত্যজিৎ রায় তাতে দুঃখ প্রকাশও করেছিলেন।

তাঁর এই পর্যায়ের ছবিতে প্রোটাগনিস্টরা কিন্তু নিজেরা রাজনৈতিক দায়বদ্ধ নয়। তবু বাইরে যখন রাজনৈতিক উত্তাল পরিবেশ তখন ব্যক্তি মানুষের, পরিবারের মধ্যে, সমাজের সম্পর্কগুলির মধ্যে কী পরিবর্তন হচ্ছে সেটা তিনি নিজেও বুঝতে চাইছেন। অরণ্যের দিন রাত্রি (১৯৬৯)-তে চৌকিদারের স্ত্রীর দারুণ অসুস্থতা জানলা দিয়ে অপর্ণা যখন অসীমকে জিজ্ঞেস করে, ''এত অসুস্থ, জানতেন?'' তখন অসীম পলায়নী জবাব দেয়। কিন্তু যখন ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ নিয়ে তৈরি 'অশনি সঙ্কেত' (১৯৭৩)-এর শেষ দৃশ্যে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে ঘরছাড়া বুভুক্ষু মানুষ একজন দু'জন করে ক্রমশ একটা গোটা মিছিলের মতো দর্শকের দিকে মুখ করে এগিয়ে আসতে থাকে পর্দায়—শ্বাসরুদ্ধ একটা মুহূর্ত তৈরি হয়। গোটা ৫০-৬০-৭০ দশক পর্যন্ত তীব্র খাদ্যাভাবের প্রেক্ষিতে শহুরে মধ্যবিত্ত দর্শককে তিনি বলতে চেয়েছিলেন—পালিয়ে বাঁচা যাবে না? মানুষের সূক্ষ্ম পরিবর্তনকে ধরতে পারা আজকের বামপন্থী আন্দোলনের সামনেও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। সরাসরি একটি কথাও না বলে, সংলাপের ছোটো ছোটো আভাসে, মোচড়ে, দেওয়াল লিখন দিয়ে, হোর্ডিংয়ে স্বৈরাচারী ইন্দিরা গান্ধীর মুখ দিয়ে, মিথ্যাবাদী এম এল এ-র পিছনে নেহরু-ইন্দিরা গান্ধীর ছবি দিয়ে রাজনৈতিক ইঙ্গিতগুলি রেখে গিয়েছেন। মনে রাখতে হবে সময়টা কী ভয়ানক দমন-পীড়নের। 'প্রতিদ্বন্দ্বী'-র চাকরির ইন্টারভিউয়ের দৃশ্য তো প্রায় প্রবাদের মতো হয়ে গেছে। ইন্টারভিউ বোর্ডের এক সদস্য প্রধান চরিত্র সিদ্ধার্থর কাছে তার মতে গত দশকের সবচেয়ে অসাধারণ ঘটনা কী জানতে চান? সিদ্ধার্থ বলে—ভিয়েৎনামের যুদ্ধ। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—চাঁদে অবতরণের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ? সিদ্ধার্থ বলে, সে তাই মনে করে। কারণ হিসাবে সে বলে, চাঁদের অবতরণ উল্লেখযোগ্য নয়, সে বলছে না, কিন্তু তা অননুমিতপূর্ব নয়। মহাকাশ বিদ্যার যেভাবে উন্নতি হয়েছে তাতে এ ঘটনা একদিন ঘটবেই জানা ছিল। কিন্তু ভিয়েতনামের যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে, ভিয়েতনামী জনগণের প্রতিরোধের অসাধারণ ক্ষমতা। তারা সাধারণ মানুষ, কৃষক। এটা টেকনোলজির বিষয় নয়, সাধারণ মানুষের সাহসের শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনা। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—আপনি কি কমিউনিস্ট? সিদ্ধার্থ বলে, ভিয়েৎনামের মহত্ব বোঝার জন্য কাউকে কমিউনিস্ট হতে হয় না। যদিও সে নিজে কমিউনিস্ট কিনা সে প্রশ্নের উত্তর সে দেয়নি। বোঝা যায় শুধু ইউরোপে নয়, সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর প্রতিটি কোনায় 'কমিউনিজমের ভূত দেখছে'। যারা সত্যজিৎ 'আর্টস ফর আর্টস সেক'-এ বিশ্বাস করতেন বলে বলেন, তাঁরা সত্যজিতের ছবিতে অন্তর্লীন রাজনীতির বুনোটকে বোঝেন না বা জেনেবুঝে অস্বীকার করেন। রাজনীতি তিনি দর্শককে জোর করে গেলাননি, দর্শকের বোধ ও বুদ্ধির ওপর ভরসা করেছেন।

তৃতীয় পর্যায়ে 'হীরক রাজার দেশে' (১৯৮০)-তে তিনি আবার রূপকে ফিরে যাচ্ছেন এবং জরুরী অবস্থা, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, শিক্ষক সবার ওপর স্বৈরশাসনের প্রভাব এবং স্বৈরচারীকে গদি থেকে অপাসারণের কথা বলছেন। আশ্চর্য লাগে চার দশকেরও বেশি আগে তিনি প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে শাসক কিভাবে প্রজাদের 'মস্তিষ্ক প্রক্ষালন' অর্থাৎ আজকের ভাষায়

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

আসন্ন বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন

সংগঠন-আন্দোলন ঐক্য ও চেতনার পুনর্নবীকরণ

বিজয় শংকর সিংহ

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন আগামী ২৪-২৬ ডিসেম্বর, ২০২২ উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা সদরে অনুষ্ঠিত হবে। ঘটনাবহুল বিগত তিনটি বছর পেরিয়ে সারা রাজ্য থেকে আমরা সমবেত হতে চলেছি এই মহতি সম্মেলনে। ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি শহরে জেলা পরিষদ হলে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে প্রায় পাঁচশত কর্মীর উপস্থিতিতে অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হয়েছেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব তমোজিৎ রায় এবং সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন জলপাইগুড়ি জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক মনোজিৎ দাস। এছাড়া অভ্যর্থনা কমিটিতে রয়েছেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অভ্যর্থনা কমিটির সভায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক সহ একাধিক সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় কর্মী নেতৃত্বন্দ স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে সংগ্রামী চেতনা নিয়ে সম্মেলনকে সফল করার লক্ষ্যে দান মেলায় অর্থ প্রদান করেন। সভায় ১৬ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয় যা সংগঠনের কাছে মাইলফলক হয়ে থাকবে।

উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জেলা জলপাইগুড়িতে সংগঠনের নেতৃত্বে কর্মচারী সমাজ বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাহসের সাথে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। পরিচিতি সত্ত্বার রাজনীতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ শক্তির প্রভাব তাকে মোকাবিলা করে গণতন্ত্র ও অধিকার রক্ষায় সংগঠন লড়াই সংগ্রাম জারি রেখেছে। তথাপি জলপাইগুড়ি ছোট্টো একটি জেলা এই সম্মেলনের দায়িত্ব আগ্রহভরেই আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা কমিটির গঠনের পূর্বেই জেলা সংগঠনের নেতৃত্বরা সম্মেলনের প্রস্তুতি শুরু করেছে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্মেলন সার্বিকভাবে সফল করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন অর্থ ও মজবুত তহবিল। জলপাইগুড়ি জেলার কর্মী কর্মচারীদের অন্যান্য জেলার কর্মচারীদের থেকে বর্ধিত আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কর্মচারীরা উৎসাহ নিয়ে ইতিমধ্যে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

১৯৫৬ সালে সংগঠনের সূচনা হলেও প্রথম রাজ্য সম্মেলন ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ সালে হয়েছিল। আজ বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে সুদীর্ঘ সময়কালের মধ্যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতির বহুমুখী পরিবর্তন ঘটে গেছে। বিশ্বজোড়া মন্দার ফলে আর্থিক সঙ্কটের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ২০০৮ সালের মন্দা গোটা বিশ্বকে গ্রাস করে চলেছে। আজ ১৪ বছর পরও পুঁজিবাদ এই সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। বরং সঙ্কট আরো গভীরে প্রবেশ করেছে।

পুঁজিবাদের কদর্য ও নৃশংস চেহারাটা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের কাছে প্রকাশ পেয়ে গেছে। অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে নানা ধরনের কৌশল নিয়ে পুঁজিবাদ প্রকৃত অর্থে পুঁজিরই সেবা করে চলেছে। সাধারণ মানুষের স্বার্থে নয়, তা কোভিড মহামারির সময় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। এই সঙ্কট প্রকৃত অর্থে একচেটিয়া পুঁজির মুনাফাকে আরও কেন্দ্রীভূত করেছে। শোষণের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। মানুষকে সর্বস্বান্ত করে সম্পদের পাহাড় জমেছে কিছু বড় বড় ধনকুবের ঘরে। পুঁজিবাদের এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য। শ্রমিক কর্মচারী তথা শ্রমজীবী মানুষ সর্বোচ্চ শ্রম নিংড়ে দিয়ে সর্বনিম্ন মজুরি অর্জন করে। অক্সফ্যাম প্রকাশ করেছে ধনী ও গরিবের সমুদ্রসম বৈষম্যের রিপোর্ট। কোভিড মহামারির দু'বছরে বিশ্বে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময় প্রতি ৩০ ঘণ্টায় একজন করে শত কোটি মার্কিন ডলারপতির আবির্ভাব ঘটেছে। বিশ্বে যখন ২ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ করোনা মহামারির শিকার হয়েছে, সেই সময় ৫৭৩ জন হয়েছে শত কোটিপতি। সারা বিশ্বে কোটি কোটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প চিরতরে বন্ধ হয়েছে। কোটি কোটি মানুষ কাজ হারিয়ে দিশেহারা। অর্থনৈতিক উৎপাদন ক্ষমতা অনেকটা লুপ্ত হয়েছে। কোটি কোটি মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমেছে। স্বাভাবিকভাবে পণ্যের চাহিদা কমেছে। কিন্তু ধনী লোকের বেড়ে গেছে মুনাফা। স্বাভাবিকভাবে বিশ্বজুড়ে পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে এবং শ্রমজীবী মানুষ লড়াই সংগ্রাম জারি রেখেছে। এছাড়াও তারা ধর্মঘটও করছে।

আমাদের দেশের আর এস এস-বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতি ও স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট ধর্মী আচরণ ও বহুমাত্রিক সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির ভয়ঙ্কর প্রভাব মানুষের জীবনে অসহনীয় করে তুলেছে। সামনে উঠে এসেছে কর্মহীনতার চরম হতাশা। বেকার সমস্যা সমাধানে সরকারের কোনো ভূমিকা নেই। দেশের সৈন্যবাহিনীতে চুক্তিপ্রথায় নিয়োগের সিদ্ধান্ত দেশের নিরাপত্তাকে দুর্বল করবে এবং যুব সমাজকে অপমান ও প্রতারণা করবে। এখন দেশজুড়ে যুব সমাজ প্রতিবাদ-ধিক্কার জানিয়ে তীব্র আন্দোলন করছে। দেশের সম্পদ জলের দরে কর্পোরেট দালালদের কাছে বেচে দিচ্ছে। দ্রব্যমূল্য ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমুখী। পেট্রোল-ডিজেলের দাম সেঞ্চুরী পেরিয়েছে ও রান্নার গ্যাসের দাম হাজার টাকার দুয়ারে পৌঁছেছে। ব্যাঙ্ক-বীমা বেসরকারীকরণ করছে। আমানতকারীদের জমানো টাকা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা আক্রান্ত। সামাজিক নিরাপত্তায় আঘাত আসছে। দেশে বেকারের সমস্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোনো হেলদোল নেই আর এস এস-বিজেপি সরকারের। কৃষক আন্দোলনের ঐতিহাসিক জয় ও স্বাধীনতার পর শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের এক নতুন সম্ভাবনাকে সামনে রেখে শ্রমজীবী মানুষের অধিকারগত দাবিগুলি নিয়ে সাধারণ ধর্মঘট করে কেন্দ্রীয় সরকারকে হুঁশিয়ারী দিয়েছে। এবং বহুমাত্রিক সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করার শপথ নিয়েছে।

কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবিতে খাদ্যভবনে কর্মচারীদের বিক্ষোভ কর্মসূচী

আমাদের রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের এগারো বছর সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজ প্রত্যক্ষ করেছে যে, আমাদের রাজ্যের তৃণমূলী শাসন অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। সারদা, নারদা দিয়ে শুরু করে রাজ্যের কৃষি শিল্প (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সহ), শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্রে এক ধ্বংসাত্মক চেহারা নিয়েছে। সমাজের সব স্তরে লুম্পেনরাজ চলছে। একদিকে বালি পাচার, কয়লা পাচার, গোরু পাচার, সোনা পাচার, নারী ও শিশু পাচার, সিন্ডিকেট রাজ সহ পঞ্চায়েত, পৌরসভা সহ প্রশাসনের সর্বস্তরে হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি চলছে যা নজিরবিহীন ঘটনা। মানুষের দুর্দশা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। করোনা, আমফান, শিক্ষক নিয়োগ, নার্স কর্মীদের নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি। বর্তমান রাজ্য সরকারের একাধিক মন্ত্রী, এম এল এ, এম পি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দুর্নীতির দায়ে সি. বি. আই ডাকছে। জেরা করছে ও জেল খাটছে, যা পশ্চিমবাংলার লজ্জা।

এছাড়া বিগত এগারো বছরে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা বিলুপ্তি করা হয়েছে। বর্তমান ৩১ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া রয়েছে। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট আমাদের দেওয়া হয়নি। রিপোর্টে কী আছে জানতে পারলাম না। যা অতীতে হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার আমাদের সব সংগঠনগুলিকে কমিশনের রিপোর্ট দিত। আমরা রিপোর্ট দেখে আলোচনা করে সরকারের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে আমাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ পেতাম। তারপর বিজ্ঞানসম্মতভাবে পে কমিশনের বর্ধিত বেতন চালু হতো। অথচ ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ কী ছিল, আর কী চালু হল কিছুই জানতে পারলাম না।

বাড়ি ভাড়া ভাতা ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২ শতাংশ করা হল। মহার্ঘভাতা ধার্য না করে ও এরিয়ার ছাড়া বেতন কমিশন চালু হল। চূড়ান্ত অন্যায় অবিচার করা হল। ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে। ধর্মঘট করলে একদিনের বেতন কাটা ও একদিনের ডায়াস নন করা হয়। ন্যায্য অধিকারের জন্য আন্দোলন করলে এফ. আই. আর., এ্যারেস্ট এবং দূরদূরান্তে বদলী করা হয়। প্রশাসনের অভ্যন্তরে লক্ষাধিক পদ শূন্য। পূরণ করা হচ্ছে না এবং চুক্তি ও এজেন্সি প্রথায় কর্মচারীদের চরম শোষণ চলছে। সরকারের দাবিগুলি নিয়ে সাক্ষাৎকার চেয়ে চিঠি দিলে দেখা করছে না, পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আসলে মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে। যুক্তি তর্কে পারবে না। কারণ তাদের কাছে এই বঞ্চনার কোনো যুক্তি নেই। তাই সারা রাজ্যের কর্মচারীরা কলকাতার রাজপথে সারারাতব্যাপী প্রতিবাদ ধিক্কার জানিয়ে দু'দিন অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচীতে রাজ্য সরকারকে হুঁশিয়ারী দিয়েছে যে, যদি সরকার কোনো ইতিবাচক ভূমিকা না নেয় ভবিষ্যতে কর্মচারী সমাজ মুখোমুখি সংঘর্ষে যেতে বাধ্য হবে।

আমাদের বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্য পরিস্থিতি নিয়ে তিনদিন ধরে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা হবে। এছাড়া বকেয়া ৩১ শতাংশ মহার্ঘভাতা, চুক্তিপ্রথায় কর্মচারীদের সমকাজে সম বেতনসহ একাধিক দাবি নিয়ে চরম অবিচার ও বঞ্চনার প্রতিবাদে কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করেই জোরদার আন্দোলন সংগ্রামে যাওয়ার লক্ষ্য স্থির করবে এই সম্মেলন।

রাজ্য সম্মেলনের পূর্বে অনুষ্ঠিত হবে জেলাগুলিতে ব্লক সম্মেলন, মহকুমা সম্মেলন ও জেলা সম্মেলন কলকাতার ৭টি অঞ্চলে সেক্টর সম্মেলন ও অঞ্চল সম্মেলন। কলকাতা সহ রাজ্যের প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে সম্মেলন করার জন্য প্রয়োজন হবে বিপুল পরিমাণ অর্থ।

সম্মেলন ছাড়াও সংগঠনের দপ্তরে দৈনন্দিন কাজকর্ম ও পরিস্থিতি মোকাবিলায় ধারাবাহিকভাবে সংগঠন আন্দোলন করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করতে হয় সংগঠনকে। একটা সংগঠনকে পরিচালনা ও জীবন্ত করে রাখতে তহবিল সংগ্রহ অভিযান করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সরাসরি কোনো সদস্য নেই। স্বাভাবিকভাবে কোনো সদস্য চাঁদা নেই। অন্তর্ভুক্ত ২৯টি সমিতি থেকে নামমাত্র মাসিক লেভি ও বাৎসরিক ৫০ টাকা এফিলিয়েশন ফি সংগ্রহ করে রাজ্যজুড়ে (ব্লক থেকে কলকাতা) এত বৃহৎ সংগঠনের খরচ চালানো সম্ভব নয়। বকেয়া আর্থিক ও অধিকারগত দাবিসহ প্রতিহিংসাপরায়ণ আক্রমণের মোকাবিলা করতে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে নিরন্তর সংগ্রাম আন্দোলন পরিচালনা করতে হয় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে। ইতিমধ্যে ২০১৮ সাল থেকে নেতৃত্ব উত্তরবঙ্গে ও মুর্শিদাবাদে বদলি হয়েছে। নেতৃত্ববৃন্দকে তাদের আর্থিক সহ পারিবারিক দিক থেকে অনেক বর্ধিত দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। তাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছে। যা সংগঠনের কাছে শিক্ষনীয়। সংগঠনের সামনে অর্থের প্রয়োজনে সমগ্র কর্মচারীর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের কোনো বিকল্প পথ নেই। যেখানে নেতৃত্ব বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে নবান্নে কর্মচারীদের স্বার্থে আন্দোলন করতে গিয়ে দূরদূরান্তে বদলী হয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

তাই বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন ও সংগঠন পরিচালনার জন্য 'সম্মেলন সংগঠন তহবিল' সংগ্রহের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। মাসিক ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট বেতন ১০০ টাকা, ৩০,০০১-৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ২০০ টাকা এবং ৫০,০০০ ঊর্ধ্বে ৩০০ টাকা হারে তহবিল সংগ্রহের আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া ফ্যামিলি পেনশনারদের জন্য ৫০ টাকা হারে ধার্য করা হয়েছে।

অবশ্য বিরোধীরা, নিন্দুকেরা, সুবিধাবাদীরা এই তহবিল সংগ্রহ নিয়েই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমে পড়বে। আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ী যে পশ্চিমবঙ্গের সচেতন কর্মচারীরা এবারেও তারা অতীতের মতোই সংগ্রামী মেজাজেই স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে তহবিল সংগ্রহ অভিযানে অংশগ্রহণ করবেন। কর্মচারীরা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, বড় করেছেন, শক্তিশালী ও মজবুত করেছেন। আজ তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সংগঠনকে দেখেছেন, চিনেছেন। সংগঠনের প্রতি আশা ভরসা নির্ভরতা ও আস্থা বেড়েছে। কোনো ক্ষেত্রেই বিনা প্রয়োজনে বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ আমাদের সংগঠন সংগ্রহ করে না। আমাদের সংগঠন গণতান্ত্রিক সংগঠন। প্রতিটি পয়সার হিসাবে (Audited Report) রাজ্য সম্মেলনে পেশ করা হয়। মামলা মোকদ্দমা করে কিছু পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা তোলা হয় না। যার কোনো রসিদ নেই বা এ্যাকাউন্টস নেই। আপসহীন সংগ্রাম আন্দোলনের মাধ্যমেই দাবি-দাওয়া অর্জন ও প্রতিহিংসাপরায়ণ আক্রমণ মোকাবিলায় করার পথেই কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করে চলেছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। তাই আমাদের সহকর্মী সচেতন কর্মচারীরা সংগ্রাম আন্দোলনের ক্ষেত্রে আবশ্যিক প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা মেটাতে কোনোদিন কোনো ক্ষেত্রেই কার্পণ্য করেননি। পশ্চিমবাংলায় রাজ্যের সংগ্রামী কর্মচারীদের এই ঐতিহ্যপূর্ণ ভূমিকার জন্য আমরা গর্ববোধ করি। রাজ্যের বিভিন্ন গণসংগঠন ও জনগণ আমাদের সংগঠনের এই ঐতিহ্য ও উজ্জ্বলতর ভূমিকার কথা জানেন। আমাদের রাজ্যে ও দেশের যে কোনো প্রান্তে জনগণ ও সমাজের যে কোনো সমস্যা ও প্রয়োজনে কর্মচারীরা কুণ্ঠাহীনভাবে সাড়া দিয়ে থাকে। যা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের সম্মান ও ঐতিহ্যের প্রভাব ফেলেছে। তাই আমাদের কর্মচারীদের প্রতি পূর্ণ আস্থা আছে। যা অতীতের যে কোনো তহবিল সংগ্রহের রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়ে এই মহতী সম্মেলনের তহবিল সফল করে তুলবেন।

জলপাইগুড়ি জেলার কর্মচারীদের আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই। তাঁরা কেউ এক মাসের, কেউ ১৫ দিনের বেতন ও বিপুল অঙ্কের টাকা তহবিলে দিয়ে রাজ্য সম্মেলন জেলায় সফল করতে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছেন। এ এক নজিরবিহীন সাফল্য যা কর্মচারী সমাজকে আরো উৎসাহিত করবে।

জেলা সম্মেলন সংগঠন তহবিলের সংগৃহীত অর্থের প্রায় সিংহভাগ জেলা তহবিলে জমা পড়বে। কেবলমাত্র কলকাতার ৭টি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত অর্থের সমস্তটাই কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা পড়বে। সেই সংগৃহীত অর্থ থেকে অঞ্চলগুলির সম্মেলন সহ কেন্দ্রীয় স্তরে সমস্ত সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। এছাড়া অঞ্চলগুলির দৈনন্দিন খরচ সহ রাজ্য ও জাতীয় স্তরের সংগ্রাম আন্দোলনে খরচ হয়। জেলা স্তরে ৩টি পর্যায়ে সম্মেলনের সমস্ত খরচ মেটানোর পর যেটুকু অর্থ থাকবে, তা দিয়ে জেলার ব্লক স্তর পর্যন্ত সংগঠন পরিচালনার দৈনন্দিন খরচ ও সংগ্রাম আন্দোলনের ব্যয়ভার গ্রহণ করা হবে। ইতিমধ্যে ধারাবাহিক কর্মসূচী ও সংগঠনের দৈনন্দিন কাজে জেলার তহবিল নিঃশেষিত। এই তহবিল সারা রাজ্যজুড়ে সফল করতে সব কর্মচারীর কাছে পৌঁছোতে হবে।

অধিকাংশ সংগঠন দপ্তরের

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

পঞ্চম পৃষ্ঠার পরে

সংগঠন-আন্দোলন ঐক্য ও চেতনার পুনর্নবীকরণ

পৌর খরচ, বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল, অন লাইন নেট ব্যবস্থা, ডাক খরচ, যাতায়াত খরচ, অতি সামান্য হলেও চা-টিফিনের ব্যবস্থা, বড় সভা করার জন্য হল ভাড়া, পোস্টার ছাপানোর খরচ, স্টেশনারী, প্রকাশ্য কর্মসূচীর জন্য ডেকরেটর ও মাইক ভাড়া করার খরচ ইত্যাদি নানাবিধ খরচের পরিমাণ ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির কারণে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন কমিটি স্তরে জেলার প্রতিনিধিদের জন্য যাতায়াত খরচ। সারা রাজ্যজুড়ে কেন্দ্রীয়ভাবে ও জেলা স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত সফরে প্রচুর ব্যয় হয়।

এছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে কর্মচারীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ না করেই, কেন্দ্রীয় তহবিলের সঞ্চিত অর্থ থেকে বিভিন্ন সময়ে অর্থ সাহায্য করা হয়। সার্বিক খরচ-খরচা মিটিয়ে সংগঠন পরিচালনার ব্যয়ভার দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তহবিল একেবারে নিঃশেষিত না হলে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তহবিল সংগ্রহ করে না। সেই জন্য কেবল আর্থিক দাবি অর্জন না হলেও মানুষ সংগ্রাম লড়াইয়ের স্বার্থে তহবিল সংগ্রহ অভিযানের ডাক দিতে দ্বিধা বোধ করেনি। এই অনন্য অতীত ঐতিহ্য নিয়েই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে।

তহবিল সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় নেতৃত্বর মধ্যে অনেকক্ষেত্রে সংশয় দেখা দিলেও, সংগ্রহের সময় কর্মচারীরা দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভুল প্রমাণ করেছেন। সংগঠনের প্রতি তাদের আশা ভরসা নির্ভরতা ও বিশ্বাস অটুট থেকেছে।

বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের প্রেক্ষাপট, সমস্যা এবং করনীয় সম্পর্কে পরবর্তীকালে আমাদের আরো আলোচনা করতে হবে। আগস্ট ২০২২ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে অক্টোবর, ২০২২ মাসের মধ্যে অর্ধদিবস ছুটি নিয়ে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে প্রতিটি ব্লকে কাঠামো পুনর্গঠনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ব্লকগুলির সম্মেলন হবে। নভেম্বর, ২০২২ দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ছুটির দিন বা পূর্ণ দিবস ছুটি নিয়ে মহকুমা সম্মেলন হবে। নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে দু'দিন ব্যাপী জেলাগুলির সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হবে। মে-জুন, ২০২২ মাসের বেতন থেকে রাজ্য সম্মেলন সংগঠন তহবিল সংগ্রহের পর বিভিন্ন পর্যায়ে সম্মেলনগুলি হবে।

বর্তমান জটিল ও কঠিন পরিস্থিতিতে ভয়াবহ সার্বিক আক্রমণের বিরুদ্ধে বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনকে নির্ধারণ করতে হবে আগামী দিনের প্রতিবাদ প্রতিরোধের সংগ্রাম আন্দোলনের কর্মসূচী। সর্বস্তরে কর্মচারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ, মত বিনিময় ও তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পরামর্শ ছাড়া সম্মেলন দায়িত্ব পালন করতে পারে না। প্রতিটি কর্মচারীর কাছে পৌঁছে তহবিল সংগ্রহের মধ্য দিয়ে সেই প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে শুধুমাত্র তহবিলে অর্থ দানের মধ্য দিয়ে কর্মচারীদের দায়িত্ব শেষ হতে পারে না। সেই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটাতে সংগঠনের সর্বস্তরে পরিকল্পনা করে সাংগঠনিক উদ্যোগ নিতে হবে। এখানে মনে রাখতে হবে তহবিল সংগ্রহ অভিযান হচ্ছে সংগ্রাম আন্দোলনের কর্মসূচী। যার মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কর্মচারী সমাজের সাথে সংগঠনের নারীর সম্পর্ক আরো নিবিড় ও দৃঢ় হয়েছে। এই তহবিল সংগ্রহের মধ্য দিয়ে সংগ্রামই সম্মেলনের প্রস্তুতি শুরুর সাথে সাথে সমগ্র সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা ও লক্ষ্য সম্পর্কেও সমগ্র কর্মচারী সমাজকে আগ্রহী ও সচেতন করে তুলতে হবে।

বর্তমান রাজ্যের সরকার কর্মচারীদের অর্জিত সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেওয়া, পাহাড় প্রমাণ আর্থিক বঞ্চনা সহ প্রতিহিংসাপরায়ণ আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। তাই সুবিধাবাদী মানসিকতার পরিবর্তে বর্ধিত সংগ্রামী চেতনাসম্পন্ন হয়েই তীব্র আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। তাই চাই সমগ্র কর্মচারীদের নিশ্ছিদ্র ঐক্য ও সংগ্রামী মেজাজ। আগামী দিনে এই পরিস্থিতি ভেদ করেই সরাসরি সংঘর্ষের পথে যেতে হবে। সরকারের বুকে কাঁপন ধরানোর মতো আন্দোলনে গিয়ে দাবি আদায়ে সরকারকে বাধ্য করতে হবে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বামপন্থী মতাদর্শে অটুট থেকে চরম শত্রু দক্ষিণপন্থী শক্তির পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। সংগ্রাম আন্দোলন ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধ ধারাবাহিকভাবে চলছে। এমতাবস্থায় সামগ্রিকভাবে এই পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে সারা দেশের শ্রমজীবী মানুষের সাথে ঐক্যবদ্ধ চেহারা নিয়ে আমরাও সমস্ত ধরনের প্রতিকূলতাকে ভেদ করেই অগ্রসর হবো। তাই সমস্ত ভয়ভীতি পরিহার করে সাহসের সাথে আত্মত্যাগের মানসিকতা নিয়ে এই কঠিন সংগ্রামে যুক্ত হতে হবে। সমস্ত স্তরের কর্মচারীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগের মধ্য দিয়ে বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে সম্মেলন সংগঠন তহবিল সংগ্রহ অভিযান সফল করতে হবে। সম্মেলন সংগঠন তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্য সম্মেলনে জাঁকজমক করা নয়, এর মাধ্যমে কর্মচারীর সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করা ও সংগঠনের বার্তা কর্মচারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন ও সংগঠনের আদর্শ নীতিগত অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করা। পরিস্থিতির প্রতিটি ঘটনাবলীর প্রান্তিক প্রক্রিয়ার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে করণীয় কর্তব্য ও কর্মসূচী নির্ধারণ করা। তহবিল সংগ্রহ অভিযান মানে নিছক অর্থ সংগ্রহ নয়, পরিস্থিতির মোকাবিলায় আগামী বৃহত্তর সংগ্রামকে আরো দৃঢ় ও মজবুত করা।

রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের অর্ধ শতাব্দীর অধিক সময়ের ইতিহাস হল আত্মত্যাগ, সাহসী, প্রতিবাদী ও চেতনাসম্পন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। আমাদের সংগঠন আত্মসমর্পণ করতে শেখায় নি, মাথা উঁচু রেখে ত্যাগ স্বীকার করে সাহসের সাথে লড়াই সংগ্রাম করতে শিখিয়েছে। আগামী দিনে প্রতিহিংসাপরায়ণ আক্রমণকে মোকাবিলায় করেই আরো উন্নত ধরনের সংগ্রাম গড়ে তুলতে ইস্পাত দৃঢ় সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। সেই পথ দেখাবে আগামী বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

আমাদের সত্যজিৎ রায়

'মাইন্ড ম্যানেজমেন্ট' করে দেখিয়েছেন। জাতপাতের শোষণকে কেন্দ্র করে প্রেমচন্দের ছোটোগল্প নিয়ে 'সদগতি' বানিয়েছিলেন ১৯৮১ সালে ভারতীয় দূরদর্শনের জন্য। ১৯৮২ সালে ১৫ মার্চ মহাকরণে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র সাংবাদিকের বলেন যে, হরিজনদের ওপর উচ্চবর্ণের অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে তৈরি সদগতি যাতে প্রচারিত না হয় সেজন্য কেন্দ্রের ওপর চাপ আছে। তেমন হলে রাজ্য সরকার ঐ ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে রাজি বলে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে। এরপরই ২৫ এপ্রিল ছবিটি একযোগে দূরদর্শনের বাকি সব কেন্দ্র থেকে দেখানো হলেও, যেখানে ছবিটির শ্যুটিং হয়েছিল সেই রায়পুর কেন্দ্র থেকে দেখানো যায়নি, রক্ষণশীলদের চাপের কাছে মাথা নত করেছিল সরকার। বাধাদানকারীদের পক্ষে বলা হয়েছিল, রায়পুরে দলিত এবং বর্ণহিন্দুদের মধ্যে সুসম্পর্ক এতে নষ্ট হবে, হিংসা ছড়াবে। অথচ সেই সময়েই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তথ্যে প্রকাশিত হয়, ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের ১১টি রাজ্যে হরিজনদের ওপর ৫৬,৫৯৬টি অত্যাচারের ঘটনা ঘটে যাতে ১৮৫২ জন নিহত হন এবং ১৯৪১ জন মহিলা ধর্ষিত হন। হিন্দুত্ববাদীদের বিপদ সেই তখনই তিনি যেভাবে বুঝেছিলেন, এদেশে খুব কম লোকই বুঝেছেন। তিনি এও জানতেন এ বিষয়ে ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে গেলে সেই ঋষিপ্রতিম মানুষটিরই আশ্রয় নিতে হবে, যাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ। ১৯৮৪ সালে 'ঘরে বাইরে'-তে জাতীয়তাবাদী বক্তব্যের আড়ালে সাধারণ মানুষকে প্রবঞ্চিত করা এবং সংখ্যালঘু নিপীড়নের রাজনীতিকে যেভাবে চিহ্নিত করেছেন সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথকে অনসুরণ করে, তার সমান সাহস আজও খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

চতুর্থ পর্যায়ে তাঁর জীবনের শেষ দুবছরে তিনটি ছবি—গণশত্রু (১৯৯০), শাখা প্রশাখা (১৯৯১), আগন্তুক (১৯৯১)। এই সময়টা ভারতীয় অর্থনীতিতে নব্য উদারনীতি ঢুকছে, নতুন করে হিন্দুত্ববাদীরা রাজনৈতিক জমি দখলের জন্য মরিয়া। 'গণশত্রু'-তেই প্রথম সত্যজিতের ছবির নায়ক নিজে লড়াইতে নেমে এলেন। সত্যজিৎ দেখালেন অন্ধ ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইটা আর একমুখী নেই, অর্থশক্তি, পেশিশক্তি, রাজনীতি জড়িয়ে গেছে। নিশীথ গুপ্তর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সত্যজিৎ দেখাচ্ছেন কুসংস্কার আর অশিক্ষিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের লোভ, ভণ্ডামির মধ্যে দিয়ে তার প্রসার ঘটছে। সার্বিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সার্বিক লড়াই করতে হবে—তাই ইবসেনের 'এনিমি অফ দি পিপল'-এর নায়কের মতো একক সংগ্রাম নয়, গণশত্রুতে মানুষের দাবি, মানুষের মিছিলে তা রূপান্তরিত হয়। শাখা-প্রশাখা দেখতে দেখতে মনে হয় দুর্নীতি-কালোবাজারি কিভাবে কবে থেকে মান্যতা পেয়ে গেল আমাদের সামাজিক জীবনে? আমরা কি উটের মতো বালিতে মুখ গুঁজে ছিলাম? 'আগন্তুক'-এ সত্যজিৎ মনমোহনের মুখ দিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, 'কাকে বলে সভ্যতা?' একটা বোতাম টিপে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতাই কি সভ্যতা? 'মনমোহন বললেন, তিনি রিলিজিয় অর্থে ধর্ম মানেন না, কারণ তা মানুষে মানুষে বিভেদ রচনা করেই। বললেন ঐ একই কারণে তিনি জাতও মানেন না। এ তো সত্যজিতের নিজের কণ্ঠস্বর! ভুললে চলবে না দুশো বছর আগে রামমোহন রায় যে সংস্কার আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করে, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা করেছিলেন, পারিবারিকভাবে সত্যজিৎ সেই মুক্তচিন্তার উত্তরাধিকার বহন করতেন। তাই রবীন্দ্রনাথের মতোই 'সভ্যতার সঙ্কট' ধ্বনিত হল তাঁর কণ্ঠে জীবনের শেষ লগ্নে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন, 'আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসে কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানীর পরিকীর্ণ ধ্বংসস্তূপ! তবু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস চিরকাল অমলিন রেখে যাব।' মনমোহনও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর বিশ্বাস রাখছেন, সত্যজিৎ দেখালেন।

এদেশে মেন স্ট্রিমের সিনেমার বাইরে অন্যধারার সিনেমার দর্শক এখনও কম। অথচ সত্যজিতের বহু ছবির জনপ্রিয়তা এখনও অটুট। এর কারণ অনুসন্ধানে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, তাঁর চলচ্চিত্রের বিষয়—মানুষ। বেশিরভাগক্ষেত্রেই তারা সাধারণ মানুষ, কখনও গ্রামীণ মানুষ, কখনও শহরের মানুষ। ভিন্ন ভিন্ন তাদের সামাজিক অবস্থান, কিন্তু তারা সবাই কোনো না কোনোভাবে বিপন্ন। তারা কোনো বীরোচিত নায়ক নয়, রক্তমাংসের মানুষের প্রতিমা ফুটে ওঠে পর্দায়, তাদের আনন্দ-বেদনা-রাগ- দ্বেষ-স্বার্থপরতার মধ্যেই কোথাও কোথাও কোনো কোনো ঘটনায় মহত্বকেও স্পর্শ করে এইসব চরিত্রের কেউ কেউ। এরা সবাই জীবন পথের যাত্রী। ইতিহাসের অনিবার্য ধারা বেয়ে তারা চলেছে। সত্যজিৎ সেই বহমান জীবনের স্রোতধারা থেকে আঁজলা ভরে তুলে নেন শৈল্পিক আধারে। জীবনানন্দ বলেছিলেন, 'আমাদের রক্তের ভিতর এক বিপন্ন বিস্ময় খেলা করে'। সাধারণ দর্শক শুধু নিজের চেনা জীবনের প্রতিবিম্বই খুঁজে পান না সত্যজিতের ছবিতে, 'এক বিপন্ন বিস্ময়' ও খেলা করে যায় এবং বার বার তারা তা দেখতে চান। মানুষের শিকড় না চিনলে এ কাজ করা সম্ভব হতো না। মানুষের মধ্যে যাদের কাজ, তাদের জন্যেওই এই শিকড় চেনার কাজ কত জরুরি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সত্যজিতের বিখ্যাত খেরোর খাতা যাতে 'অপরাজিত' ছবির সময় থেকে তার যাবতীয় শৈল্পিক ভাবনা যখন যেমন মনে আসত লিখে রেখে গেছেন, সেখানে মাঝে মাঝে লিখেছেন, 'জানি না', 'আমি জানি না, তোমাকে কীভাবে বলতে হয়, আমি জানি না'। পৃথিবীর বহু দিকপাল মানুষ যাঁরা জানার পরিধি নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, তিনি লিখেছেন, 'জানি না'! জীবনানন্দের 'বোধ' কবিতার কথা মনে হয়—'সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে / কে থামিতে পারে এই আলোয় আঁধারে / সহজ লোকের মতো; তাদের মতো ভাষা / কে বলিতে পারে আর; কোনো নিশ্চয়তা ; কে জানিতে পারে?...' □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

সুকোমল সেনের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন

এমপ্লয়িজ ফোরামের সম্পাদনার পাশাপাশি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হল 'ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস', 'মে ডে এন্ড এইট হাওয়ারস্ স্ট্রাগল ইন ইন্ডিয়া'। জীবনের শেষপর্যন্ত অসুস্থ অবস্থাতেও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের ৭৪ বছরের ইতিহাস সম্পর্কে দু'খণ্ডের সরকারী গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন।

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন ১৯৬১ সাল থেকে যাত্রা শুরু করলেও, দীর্ঘদিন এই সংগঠনের কোনো নিজস্ব দপ্তর ছিল না। বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদকরা যে রাজ্য থেকে প্রতিনিধিত্ব করতেন, সংশ্লিষ্ট রাজ্য থেকেই সংগঠনের হেড কোয়ার্টার্স পরিচালিত হতো। এইভাবে অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হয়েছে হেড কোয়ার্টার্স।

কমরেড সুকোমল সেন নেতৃত্বে থাকাকালীনই দিল্লি বা দিল্লি সংলগ্ন কোনো জায়গায় সর্বভারতীয় সংগঠনের স্থায়ী হেড কোয়ার্টার্স গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় জমির সন্ধান পাওয়ার পর সারা দেশজুড়ে কর্মচারীদের কাছে ভবন নির্মাণ তহবিল সাহায্যের আবেদন জানানো হয়। ধীরে ধীরে কমরেড সুকোমল সেনের স্বপ্ন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে দিল্লির সন্নিহিত ফরিদাবাদে। কিন্তু সুকোমল সেন এই ভবন দেখে যেতে পারেননি। ২০১৭ সালের ২২ নভেম্বর তাঁর প্রয়ান ঘটে। তাঁর স্বপ্ন এখন সফল হওয়ার পথে। তাই সর্বভারতীয় সংগঠনের বর্তমান নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে ভবনটির নাম হবে সুকোমল সেন ভবন। এই ভবনের প্রবেশদ্বারে বসবে কমরেড সুকোমল সেনের একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তি। এই মূর্তিটি নির্মাণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। ২২ জুন, কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভার প্রারম্ভে মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করেন সর্বভারতীয় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার। উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ শশীকান্ত রায়। উভয়েই তাদের বক্তব্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে কমরেড সুকোমল সেনের সংগ্রামী জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানান। সর্বভারতীয় সংগঠনের ইতিহাসে সংক্ষেপে বিবৃত করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় সংগঠনের সহ সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী এবং সহ সভাপতি সুতবা হাজরা। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

১২ই জুলাই কমিটির নবম রাজ্য কনভেনশন

উত্থাপিত প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন মোট ৩৩ জন। অন্তর্ভুক্ত সমিতিরগুলির পক্ষে ১৫ জন এবং জেলাগুলি থেকে ১৮ জন আলোচনা করেন। কনভেনশনে মোট ৬টি প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। এছাড়াও একটি জেলা থেকে উত্থাপিত সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

আয়-ব্যয়ের হিসাবের উপর আলোচনার জবাবী ভাষণ দেন প্রদীপ গুপ্ত। প্রতিবেদনের উপর আলোচনার জবাবী ভাষণ দেন অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক তপন দাশগুপ্ত। কনভেনশন থেকে নতুন কমিটি নির্বাচিত হয়। নবনির্বাচিত যুগ্ম আহ্বায়কদ্বয় হলেন সুমিত ভট্টাচার্য ও মনোজ সাউ। দপ্তর সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন বিভাষ ঘড়া। ১৩ জনের ওয়ার্কিংবডিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য ছাড়াও রয়েছেন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ এবং যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। কনভেনশন থেকে পঞ্চায়েত যৌথ কমিটিকে ১২ই জুলাই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে কনভেনশন সমাপ্ত হয়।

দু'দিনের এই কনভেনশন পরিচালনা করেন কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, বিজয় শঙ্কর সিংহ, অনুপ চক্রবর্তী, মীরা ঘোষ এবং সৌগত চক্রবর্তীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

১৯৯২-র থেকেও এখন পরিস্থিতি অনেক বেশি ভয়ঙ্কর

সীমা চিস্তি

জ্ঞানব্যাপী প্রসঙ্গকে সামনে আনা কোনো ইতিহাসের বিষয় নয়। এটি একটি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ এবং একটি আধিপত্যবাদী প্রকল্পের অংশ।

অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার ঠিক তিরিশ বছর পরে জ্ঞানব্যাপী মসজিদ বিতর্ককে সামনে নিয়ে আসার মধ্য দিয়ে সাদৃশ্য অপেক্ষা দুটি পরিস্থিতির মধ্যে যে পার্থক্য তাই বিশেষ করে নজরে আসছে। ঠিক যেভাবে স্থাপত্যবিদ্যায় ইট, কাঠ পাথরের ভাঙা টুকরোর সাথে একটি স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়, আমাদেরও ঠিক একইরকম পরিষ্কারভাবে সেই সময়কার অযোধ্যার বিষয়টি এবং ২০২২ সালে বারাণসীর জ্ঞানব্যাপী মসজিদ বিতর্কের মধ্যে পার্থক্যটা বোঝা দরকার। পার্থক্যটা খুবই স্পষ্ট।

এখন একটা আইন রয়েছে ঃ

প্রথম পার্থক্য হল উপাসনাস্থল (বিশেষ বিধি) আইন ১৯৯১। যা ১৯৯১ সালে যখন অযোধ্যা কেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বাঁধছিল, তখন ছিল না। এমনকি অযোধ্যা এই আইনের আওতার বাইরেও ছিল। ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায় ১০ পাতা জুড়ে (পৃঃ ১১৬-১২৫) ব্যাখ্যা করে ১৯৯১ সালের আইনের গুরুত্ব এবং কিভাবে তা ''সংবিধানের মূল আদর্শকে রক্ষা এবং নিশ্চিত করছে।'' আইনটির যুক্তির সাথে সহমত পোষণ করে পাঁচজন বিচারপতির বেঞ্চ বলেছিল, ''উপাসনাস্থল আইনটি ভারতীয় সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কিত দায়বদ্ধতা কার্যকরী করার প্রতি অলঙ্ঘনীয় বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দিয়েছে।''

মাত্র তিন বছর আগে দেওয়া নিজেদের আদেশের মূল ভাবনা অনুযায়ী বিষয়টিনে না সাজিয়ে, বরং দুদিক বজায় রাখার চেষ্টা করে, আইন এবং তার ব্যাখ্যাকর্তারা ভারতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং উদ্বেগজনক পরিবর্তনের রাস্তা খুলে দিচ্ছেন। আজকের সময়টা বাবরির মতো নয়, কারণ আইনটি বাবরি ছাড়া অন্যান্য সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং বাবরি একটা ব্যতিক্রম। এইভাবে চললে, একটা 'প্যান্ডোরা' বাক্স খুলে যাবে। একই ধরনের অজস্র ঘটনা গজিয়ে উঠবেই। মথুরার শাহী ইদগাহ এবং কুতুবমিনারের চারপাশে খোঁড়ার আবেদন ইতিমধ্যে আদালতে পৌঁছেছে। সর্বপল্লী গোপাল 'অ্যানাটমি অফ কনফেনট্রেশন'-এর ভূমিকায় লিখেছেন, এই ধরনের দ্বন্দ্ব ১৯৪৭ সাল থেকেই নজরে নিয়ে আসছে একধরনের অসুস্থতাকে, যা স্বাধীন ভারত দূর করতে পারেনি। যদি ১৯৯১ সালের আইনের উদ্দেশ্য হয় প্রজাতন্ত্রকে বাবরির প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করা, তাহলে বারাণসী প্রসঙ্গটিকে ক্রমশ সামনে নিয়ে আসার অর্থই হল ঐ 'অসুস্থতাকে' আবার খুঁচিয়ে তোলা। উদ্দেশ্যটা ছিল ১৯৪৭ সালে দাঁড়ি টানা এবং অযোধ্যার বিতর্কের পর একটা চূড়ান্ত সমাধানে পৌঁছনো। বাবরি বিতর্ক যে ফাটল ধরিয়েছিল, তা দেখা সত্ত্বেও, এখন তিরিশ বছর পরে যদি আবার জ্ঞানব্যাপী বিতর্ককে ডাল-পালা মেলার সুযোগ করে দেওয়া হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে সংবিধান যে প্রসঙ্গগুলির মীমাংসা করেছিল, ভারত তা আবার নতুন করে সামনে নিয়ে আসছে। যা পূণরায় বিপর্যয় ডেকে আনবে।

একটি প্রাতিষ্ঠানিক পতন ঃ

অযোধ্যার সময়ের সাথে বর্তমান সময়ের আরও একটা পার্থক্য হল ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা। আধুনিক প্রতিষ্ঠান সমূহের উপস্থিতিই 'গণতন্ত্র' ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়। একমাত্র এই প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীন ভূমিকাই সংবিধান প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলিকে সম্মান জানাতে পারে। গণতন্ত্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের কাজই হল, শাসন বিভাগকে ক্রমাগত প্রশ্ন করা এবং নিশ্চিত করা যাতে যে সংবিধানের শপথ নিয়ে শাসনবিভাগ পরিচালিত হচ্ছে, সেই সংবিধানের নির্দেশ মেনেই যেন অগ্রসর হয়। কিন্তু ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতার বড়সড় বিপর্যয় ঘটেছে। এই বিপর্যয়ের ফলে ভারতে গণতন্ত্রের পশ্চাদপসরণ ঘটছে। ভারতকে এখন চিহ্নিত করা হচ্ছে 'নির্বাচনী স্বৈরতন্ত্র' (ভি-ডেম ইনস্টিটিউট)। আংশিক স্বাধীন (ফ্রিডম হাউস), ১৯৭৫ সালে ঘোষিত জরুরী অবস্থার সময়কার মতো পরিস্থিতি (ইন্টারন্যাশনাল আইডিয়া) এবং সংবাদ মাধ্যমের

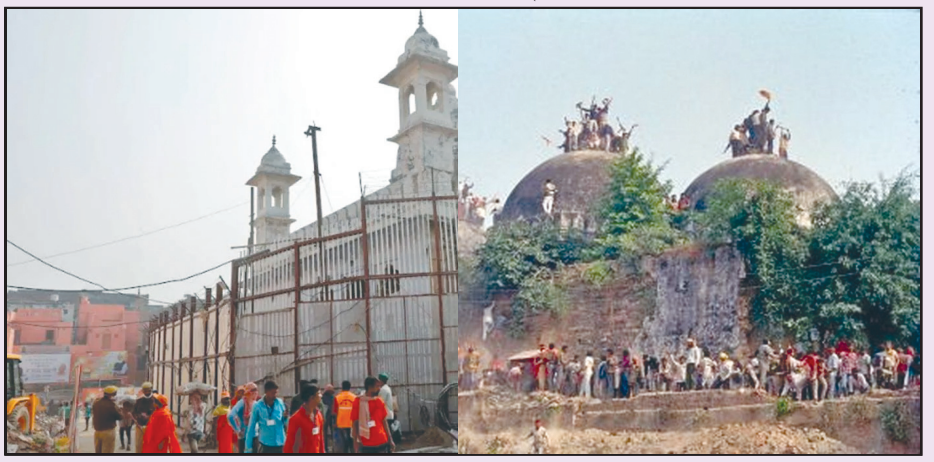

স্বাধীনতার প্রশ্নে ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান এখন সব থেকে খারাপ ৩০টি দেশের মধ্যে। দ্য ওয়ার্ল্ড ভ্যালুস সার্ভে এবং পিউ রিসার্চ সেন্টার জানাচ্ছে যে, ২০১৫ সাল থেকে ভারতে গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হিসেবে নাগরিক অধিকার এবং এমনকি গণতন্ত্রও সর্বাধিক দুর্বল হয়েছে। এইরকম পরিস্থিতিতে জ্ঞানব্যাপী যদি অন্যকিছুর দিকে ইঙ্গিত করে, তাহলে ৩০ বছর আগের মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পাল্টা চাপ তৈরি করার জায়গায় নেই। ২০০২-এর হিংসা সম্পর্কে বিচারপতি জে এস ভার্মার (তখন তিনি মানবাধিকার কমিশনের চেয়াম্যান ছিলেন) প্রতিবেদন আজকের দিনে ভাবাই যায় না।

১৯৯২ সালের সাথে আরও একটি পার্থক্য হল, সেই সময় অর্থনৈতিক উদারবাদ তখনও তেমনভাবে যাত্রা শুরু করেনি। উদারবাদের ভক্তদের কথা যদি মেনে নিতে হয়, তাহলে তা ছিল পুরনো ভারত। তখন একটা ধারণা তৈরি করা হচ্ছিল যে পরিবর্তীত অর্থনীতি ভারতের দমনমূলক সামাজিক রীতিকে ধ্বংস করে দেবে। বার্লিন প্রাচীর ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পরবর্তী—এটাকে একটা বড় পরিবর্তন হিসেবে জোর গলায় দাবি করে বলা হয়েছিল, অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন, পুরনো পরিচিতি ভিত্তিক প্রসঙ্গগুলিকে চূড়ান্ত আঘাত করে মানুষকে মুক্ত করবে। কিন্তু ৩০ বছর পরেও অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি পরিচিতি সত্তা ভিত্তিক রাজনীতিকে পরাস্ত করতে পারেনি। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা বরং আমাদের বিপরীত ধারণার দিকেই ঠেলে দেবে। পরিচিতি সত্তার রাজনীতির আরও কঠিন ও সঙ্কীর্ণ চেহারা এখন আমাদের চেপে ধরেছে। বর্তমান সময়ে, উদারবাদ অনেকটা পথ চলার পরে যখন অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অভূতপূর্ব মাত্রায় সম্পদের কেন্দ্রীভবন ও ধান্দাতন্ত্রের প্রসার ঘটেছে, ভারত তখন আশঙ্কাজনকভাবেই বিপজ্জনক পরিস্থিতির ফাঁদে পড়েছে। ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট, গভীর ও বর্ধমান বৈষম্যের পাশাপাশি কর্মহীনতার হতাশাজনক পরিসংখ্যান তুলে ধরছে। ১৯৯০-এর দশকে ভারত সম্পর্কে কল্পনায় বা বাস্তবে যে প্রত্যাশাগুলো তুলে ধরা হয়েছিল, আজ তার কোনোটাই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঠিক এই সময়েই জ্ঞানব্যাপী বিতর্ককে খুঁচিয়ে তোলা হচ্ছে এমন একটা পরিস্থিতিতে যখন সর্বরোগহর ওষুধ হিসেবে অর্থনৈতিক উদারবাদের ধারণা মুখ থুবড়ে পড়েছে এবং নব্বই দশকের বিশ্ব পরিস্থিতি আর নেই।

আদর্শগত, শুধু রাজনৈতিক নয় ঃ

১৯৮০-র দশকের শেষ পর্বে অযোধ্যা প্রসঙ্গকে বিতর্কের কেন্দ্রে নিয়ে আসার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গণআন্দোলন ছিল। যে রাজনৈতিক দলটি এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল, তারা এর থেকে স্থায়ী সুবিধা পেয়েছিল। কিন্তু ২০২২-এর ঘটনাকেও একইভাবে দেখলে এর মূল তাৎপর্য অনুধাবন করা যাবে না। পর পর দুটি নির্বাচনে বিপুল জয়ের পরে, এটা শুধু অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে ভোটারদের দৃষ্টি ঘোরানো বা পরবর্তী নির্বাচনে নিজেদের পক্ষে ভোটারদের টেনে আনার জন্যই নয়। এটা এখন শাসকদলের মূল আদর্শগত বিশ্বাসের অঙ্গ। তারা চাইছে কোনো আন্দোলন ছাড়াই আদালত এখন এই উপহার তাদের হাতে তুলে দিক। শাসকদলের কাছে এটা কোনো সমস্যার পথ নয়, বরং কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছনোর পরিকল্পনার অঙ্গ। সুতরাং এমন কোনো সম্ভাবনা নেই যে বর্তমান সরকার বাধ্য হবে, বহুদিন আগেই নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া বিভিন্ন প্রসঙ্গ পুনরায় যারা উত্থাপন করছে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে।

জ্ঞানব্যাপী নিয়ে নতুন উদ্যোগ কোনো ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয় নয়। ভারতীয় ইতিহাস এতটাই জটিল যে একে শুধু মাত্র হিন্দু বনাম মুসলিম এই পরিধির মধ্যে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। হাজার হাজার বছর ধরে ভারত একইসাথে সহাবস্থান ও সংঘাতের বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। শৈব বনাম বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ বনাম শ্রমণ, বৌদ্ধ ও জৈন বনাম অন্যান্য—এমন বহু ধরনের বিতর্ক অতীতে দানা বেঁধেছে। বর্তমান সময়ে যা ঘটছে তা কার্যত মধ্যযুগে ইসলামপন্থী ও খ্রিস্টীয়দের ভূমিকার মতোই। জ্ঞানব্যাপী বিতর্ক পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পরিচালিত এবং এটি একটি আধিপত্যবাদী প্রকল্পের কেন্দ্রে রয়েছে। এটি উন্মত্তের মতো নাম পরিবর্তন, ধর্মান্তকরণ বিরোধী ও গবাদি পশু আইন, হত্যা, স্বীকৃত ইতিহাসের পরিবর্তন, গণমাধ্যমে সংখ্যালঘু বিরোধী ঘৃণা ছড়ানো ও মুসলিম বিদ্বেষ সৃষ্টির অন্যান্য উপায় এবং ভারতের সমৃদ্ধ অতীতকে বিকৃত করার থেকে কোনো বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ নয়।

ইসলাম ধর্ম কুডনগ্যালুরে (কেরালা) প্রবেশ করা অথবা হিন্দুকুশ পেরিয়ে আসার বহু আগে থেকেই, ভারত ছিল আন্তঃবহুজাতীয় ঐক্যের স্থল। এবং সকলেই একে নিজের দেশ বলতেন। এটি এখন প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য যে বহুধা প্রব্রজন বা অভিবাসনই ভারতকে সৃষ্টি করেছে।

ফিরাক গোরখপুরী (অধ্যাপক রঘুপতি সহায় নামেও যিনি পরিচিত) যেমন বলেছেন, বহু ক্যারাভ্যান (যাত্রীবাহী যান) এদিকে এসে ধীরে ধীরে ভারতকে গড়ে তুলেছে। ভারতের মিশ্র জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্রে রেখে, ১৯৫০ সালে একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হল অসংখ্য বিদ্রোহকে, বিশেষত ১৯৪৭ পরবর্তীতে সংগঠিত বিদ্রোহগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার।

ভারতের সংবিধান সকলকে মুক্তির সুযোগ দিয়েছিল। বর্তমান শাসকের মতাদর্শগত পূর্বসূরীরা যদিও সংবিধানের এই ধারণাকে কখনোই গুরুত্ব দেয়নি এবং বিশ্বাস করত যে ভারত শুধুমাত্র হিন্দুদেরই দেশ। ঠিক যেভাবে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পাকিস্তান আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল। এখন, ২০১৪-র আট বছর পরে ভারত সরকারের পক্ষে এই ধরনের ঘটনাগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যতিক্রমী ঘটনা বলে বিশ্বকে বোঝানো কঠিন। কারণ বাস্তবে যা ঘটছে তাকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। 'ব্যতিক্রমী'-র ব্যাখ্যা যখন ধোঁপে টিঁকছে না, এবং ভারত দক্ষিণ এশিয়ার আরও একটি জাতিগত আধপত্যকারী শক্তি হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে, তখন ভারতের অতীত ঐতিহ্য ডুবে যেতে বাধ্য এবং 'মহান' মর্যাদা অর্জনও সম্ভব হবে না।

একটি প্রশস্ত রাস্তা বনাম সরু গলি ঃ

১৯৯২-এর ঘটনা যদি আমাদের বোধোদয় ঘটায়, তাহলে আমাদের পক্ষে ভিন্ন পথ অনুসরণ করা সম্ভব। কিন্তু তা করতে হলে শাসক দলকে অ-হিন্দুদের জন্য গোলওয়ালকরের যে নির্দেশ, তাকে বর্জন করতে হবে। ''কোনো দাবি নয়, কোনো বিশেষ সুবিধার আশা নয়, কোনো বিশেষ প্রাপ্তির সুযোগ নেই, এমনকি নাগরিক অধিকারও নয়।'' (গোলওয়ালকর, উই আর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড, ১৯৩৯, পৃঃ ৬২)। যাঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে রয়েছেন, তাঁদের উচ্চকণ্ঠে মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী গডসের ঘৃণা ও হিংসাকে বিসর্জন দিতে হবে। আফগানিস্তানে তালিবানরা, পাকিস্তানে সুন্নী মুসলিম জাতীয়তাবাদ, শ্রীলঙ্কায় সংখ্যাগুরু আধিপত্যবাদ বা মায়ানমারের বর্তমান অবস্থা আমাদের পথ নয়, বরং এগুলি আমাদের কাছে সতর্কীকরণ। 'জ্ঞানব্যাপী' যার অর্থ জ্ঞানের ফোয়ারা, আমাদের কাছে একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। বাবরি মসজিদের তিরিশ বছর পরে, আমাদের কাছে অন্ধকার গলিটা এবং অন্যান্য পরিণতি পরিচিত। এই রাস্তা এতটাই সরু যে দ্রুত ফিরে আসা সম্ভব হবে না। □

[সৌজন্যে ঃ দ্য হিন্দু, মে ২৪, ২০২২, অনুবাদ ঃ সুমিত ভট্টাচার্য]

আলোচনা সভা

কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে আসন্ন ২৮-২৯ মার্চ, ২০২২ দেশজোড়া ধর্মঘটের সমর্থনে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা সংগঠিত হয় কলকাতাস্থিত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবন-এর অরবিন্দ সভাকক্ষতে। ''প্রতিরোধ করো উগ্র হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন, রক্ষা করো দেশ ও দেশের সংবিধান''—বিষয় এর মূল আলোচক হিসাবে উপস্থিত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য তথা সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য বলেন, আজকে শুধুমাত্র রাজ্য সরকারী কর্মচারী নয়, গোটা দেশের সমস্ত মানুষের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকের আলোচ্য বিষয়। আমাদের মনে রাখতে হবে হিন্দু ধর্ম আর আজকের 'হিন্দুত্ব' এক নয়। আজকের হিন্দুত্ব রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক প্রকল্প। আর এস এস হিন্দুত্বকে তাদের অ্যাজেন্ডা হিসাবে গ্রহণ করলেও স্বাধীনতা পূর্ববর্তীতে তারা সফলতা পায়নি। স্বাধীনতা পরবর্তীতে তারা তাদের প্রচারের কৌশলকে পরিবর্তন করে বিভিন্ন অংশের মানুষের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে যা চূড়ান্ত রূপ পায় ১৯৯১ সালে ভারতবর্ষের সংসদে গৃহীত উদার অর্থনীতির হাত ধরে। ভারতবর্ষে উদার অর্থনীতির আগমন আর বাবরি মসজিদ ধ্বংস কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, কারণ আমরা জানি পরজীবিদের বেঁচে থাকতে যেমন অন্য দেহের প্রয়োজন হয়, তেমনি ফ্যাসিবাদী অ্যাজেন্ডা হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসন ঘটাতে চাই সেরকমই উৎকৃষ্ট মাঠ আর নয়া উদারবাদী অর্থনীতির থেকে নিজেদের লক্ষ্যের ফসল তুলতে আর এস এস চূড়ান্ত সফল। জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলন কেন্দ্রীয় সরকারকে কালা তিন কৃষি আইন প্রত্যাহারে বাধ্য করলেও উত্তরপ্রদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনে রাজ্য শাসনে চূড়ন্ত ব্যর্থ যোগী সরকার পুনরায় জয়ী হয়। কারণ হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন আর কর্পোরেটে পুঁজি একজোট হয়ে কাজ করে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে। নয়া উদারনীতি আর কর্পোরেটে পুঁজির মদতপুষ্ট হিন্দুত্ববাদ যখন আগ্রাসীভাবে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান, মানুষের স্বাধীনমুক্ত চিন্তা, জনকল্যাণকর অর্থনীতিকে বদলে দিতে চাইছে, মিডিয়াকে নিজেদের পক্ষে নির্লজ্জের মতো ব্যবহার করছে তখন এই আগ্রাসী আক্রমণকে প্রতিহত করতে আগামী ২৮-২৯ মার্চ ২০২২-এর দেশজোড়া শ্রমজীবী মানুষকে সামিল হতে হবে দেশ বাঁচানোর লড়াইতে, দেশ স্তব্ধ করার, ধর্মঘট সফল করার মধ্য দিয়ে। আমাদের রাজ্যেও যে দমবন্ধ করা পরিস্থিতি তাকে পরিবর্তন করতে, আমাদের অর্জিত অধিকার রক্ষার্থে ভারসাম্যের পরিবর্তন করা ছাড়া অন্য কোনোও পথ নেই। আর বামপন্থীদের এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রতিপালন করতে হবে। আলোচকের আলোচনা শুরুর প্রারম্ভে তাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধিত করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য।

কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলার কর্মী নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য বলেন আজকে দেশের শ্রমজীবী মানুষের ওপর যেভাবে দেশ ও রাজ্যের শাসকশ্রেণী আক্রমণ নামিয়ে এনেছে তাকে প্রতিহত করতে সংগঠিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। একই সঙ্গে আজকে আমাদের সামনে বিপদ হিসাবে উপস্থিত হয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের নামে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের ওপর আক্রমণ, জনগণের মৌলিক অধিকারগুলি একে একে আক্রান্ত হচ্ছে। এই আক্রমণকে একমাত্র প্রতিহত করতে পারে লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে দেশের শ্রমজীবী- কৃষিজীবী-মেহনতী জনগণ। এদিনের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অমিতাভ সাহা। সভার প্রারম্ভে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন সমিতির সদস্যদ্বয় আবীর মিত্র ও জয়ন্ত নাথ। □

বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের প্রচারে মহিলা কমরেডগণ

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্মেলন-সংগঠন তহবিল সংগ্রহের কাজ চলছে

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
50th Year, 1st & 2nd Edition, May-June 2022
Regd. No. : 18484/71

সমাজকর্মী তিস্তা শীতলবাদকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ও সেনাবাহিনীর চুক্তি নিয়োগের অগ্নিপথ প্রকল্প বাতিলের দাবিতে

সারা রাজ্যে ১২ই জুলাই কমিটির বিক্ষোভ কর্মসূচী

দার্জিলিং

পুরুলিয়া

উত্তর ২৪ পরগনা

মহাকরণ

দক্ষিণাঞ্চল

বিশিষ্ট সমাজকর্মী এবং প্রতিবাদী চরিত্র তিস্তা শীতলবাদ ও ওয়েব সাংবাদিক মহম্মদ জুনেইবের অন্যায় আটকের প্রতিবাদে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা ও কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরের মতোই সেনাবাহিনীতেও চুক্তি নিয়োগের 'অগ্নিপথ' প্রকল্প বাতিলের দাবিতে ১২ই জুলাই কমিটির ডাকে ২৯ ও ৩০ জুন দুপুরে টিফিন বিরতিতে ও অফিস ছুটির পরে সারা রাজ্যে বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। ১২ই জুলাই কমিটির অন্তর্ভুক্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারী, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের সংগঠনগুলি এবং ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কর্মচারীরা কোথাও যৌথভাবে, কোথাও নিজ নিজ সংগঠনের উদ্যোগে বিক্ষোভ কর্মসূচীতে শামিল হন। কলকাতায় রাজ্য সরকারী ও কেন্দ্রীয় সরকারী প্রধান প্রধান প্রশাসনিক ভবনগুলিতে ২৯ ও ৩০ জুন বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। জেলাগুলিতে সদরের পাশাপাশি বিভিন্ন মহকুমা ও ব্লকেও বিক্ষোভ কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলির অনুগামীরা অংশ নেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর ও বারুইপুরে, বাঁকুড়া শহরের মাচানতলায়, আলিপুরদুয়ারের সদরে, পুরুলিয়া জেলায় জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে ও রঘুনাথপুর ব্লকে, উত্তর ২৪ পরগনায় জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচী হয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। নবগঠিত ঝাড়গ্রাম জেলাতেও কেন্দ্রীয়ভাবে সুভাষ মূর্তির সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। হাওড়ায় নিউ কালেক্টরেট বিল্ডিংয়ের সামনে, হুগলী জেলা সদরে এবং আরামবাগে এলআইসি দপ্তরের সামনে এই বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। □

মহার্ঘভাতার দাবিতে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচী

গত ২০-২১ মে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাত্রিব্যাপী গণঅবস্থান কর্মসূচীর মঞ্চ থেকেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে মে মাসের শেষ সপ্তাহে সারা রাজ্যজুড়ে বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচী প্রতিপালিত হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৩-২৭ মে সারা রাজ্যে বিক্ষোভ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। □

স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী

বিংশতিতম সম্মেলনের প্রাক্কালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, **বাঁকুড়া জেলা শাখা**র উদ্যোগে গত ৯ জুলাই, ২০২২ স্থানীয় স্কুল ডাঙাস্থিত এ বি টি এ হলে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর দেহদান কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। কর্মসূচী উদ্বোধন করেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক দেবজিৎ চক্রবর্তী। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের অ্যানাটমী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ অর্পন গোস্বামী ও ব্লাড ব্যাঙ্কের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ সুদর্শন সরেন এবং কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রনব মুখার্জি, অতনু মজুমদার প্রমুখ। সভায় ১৮ জন মরণোত্তর দেহদান করেন ও ৩২ জন রক্তদান করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালন করেন সভাপতি সুনিল মাহাত। □

কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে সামাজিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে রক্তদান কর্মসূচী প্রতিপালিত হল বিগত ২৪ জুন ২০২২ শুক্রবার সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তর ৭১ সার্পেনটাইল লেন-এ। রক্তদান উৎসবের উদ্বোধন করেন অ্যাসোসিয়েশন অব হেলথ সার্ভিস ডক্টরসের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মানস গুমটা। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি আশিষ ভট্টাচার্য। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক কল্যান সেন বরাট।

সভা পরিচালনা করেন সমিতির সভাপতি অমিতাভ সাহা। পরিবারের ৩ (তিন) জন মহিলা সহ মোট ৭০ (সত্তর) জন রক্তদান করেন এবং গোটা রাজ্য থেকে ২৫০ (আড়াই শতাধিক) অধিক সদস্যবন্ধু ও তাদের পরিবারের সদস্য সহ উপস্থিত ছিলেন। □

গত ৪ঠা ২০২২ **রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি রাণাঘাট মহকুমা** শাখার উদ্যোগে রক্তদান কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন এ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ্ সার্ভিস ডক্টরস্-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ডাঃ শ্যামল কুমার পোড়ে। ডাকঘর কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত ঐ কর্মসূচীতে মোট ৪ জন মহিলা সহ মোট ৩০ জন রক্ত দান করেন। □

বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে গত ৮ জুলাই কমরেড জ্যোতি বসুর জন্মদিবসে জলপাইগুড়ি জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ সুদীপন মিত্র। মোট ৯০ জন রক্তদান করেন।

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।